তার ছোটবেলা

আদান প্রদান

তার ছোটবেলা

কৃষ্ণ বলদেব বৈদ

অনুবাদ
নন্দিতা মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ভূমিকা

কৃষ্ণ বলদেব বৈদের 'উসকা বচপন' হিন্দি সাহিত্যে এক নতুন ধরনের উপন্যাস। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের একটি ছোট্ট ছেলে বীরু, তারই গল্প এটি। এ কাহিনীতে ছেলেটির মানসিক বিকাশ এবং সেই সঙ্গে তার পারিপার্শ্বিক জীবনের ছবি আঁকা হয়েছে। লেখক এই ছেলেটির পারিবারিক জীবনের পটভূমিকায় তার মনোভাব, চিন্তাভাবনা এবং ক্রিয়াকলাপের নিখুঁত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনায় গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া, নানা স্মৃতি আর আবেগ এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে বিকশিত বুদ্ধিজাত ক্রিয়াকলাপ—এই সবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে একটি ছোট ছেলের বড় হয়ে ওঠা। তার চারপাশের মানুষগুলি এবং যে পরিস্থিতির মধ্যে সে থাকে—সেই সব কিছুর সঙ্গে তার সহজ সরল ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে জন্ম নেয় তার যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। এইভাবে কেবল যে তার নির্মীয়মান ব্যক্তিত্বটির ছবিই ফুটে ওঠে তা নয়, সেই সঙ্গে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য চরিত্রগুলির স্বরূপও স্পষ্টভাবে আলোকিত হয়ে ওঠে। 'উসকা বচপন' উপন্যাসের লেখক অতি বিশদভাবে অথচ সূক্ষ্মতা ও সংযমের সঙ্গে বীরু এবং তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে সমগ্রভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। বীরুর জীবনে তার মা, বাবা, দাদী, দেবী, চাচা, পারো, আসলাম, হাফিজা, নরেশ, বহেনজি, জলালপুরণী ইত্যাদি বহু চরিত্রের আসা-যাওয়া চলতে থাকে, কেউ অল্প সময়ের জন্য, কেউ বা অনেকক্ষণ অনেকবার আসে। এই সব চরিত্র বীরুর কচি মনের ওপর নানা অভিজ্ঞতার ছাপ ফেলে যায় ঠিকই, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের নিজস্ব স্বভাব ও ব্যক্তিত্বের একটি সুস্পষ্ট পরিচয়ও রেখে যায় আমাদের কাছে।

সংক্ষেপে বলা চলে, চরিত্রগুলির অন্তর্লোকে আলোকপাত করে তাদের সঠিকভাবে চিনিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা লেখকের আছে। তাঁর অন্যান্য রচনাতেও এই ক্ষমতার পরিচয় চোখে পড়ে। জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্পর্কিত ছোট ছোট নানা প্রসঙ্গকে তিনি ছায়াছবির মতো একের পর এক তুলে ধরেন

পাঠকের সামনে, আর তাদের সাহায্যে জীবনের কিছু না কিছু তাৎপর্য বুঝিয়ে দেন আমাদের। বীরুর পরিবারের দারিদ্র্য এবং তা থেকে সৃষ্টি হওয়া বিড়ম্বনা, তিক্ততা, কঠোরতা, নীচতা এবং অসহ্য সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর মনোবৃত্তির এমন তীব্র তীক্ষ্ণ চিত্রণ কথাসাহিত্যে সত্যিই বিরল। অনেক সময়েই দেখা যায়, কথাশিল্পীরা দারিদ্র্যের ছবি আঁকতে গিয়ে ভাবপ্রবণ হয়ে পড়েন— দারিদ্র্যকে যতদূর সম্ভব করুণরসে সিক্ত এবং নাটকীয়তায় পূর্ণ করে থাকেন। কিন্তু 'উসকা বচপন'-এ এ রকম নাটকীয়তা বা ভাবপ্রবণতার চিহ্নমাত্র নেই। লেখক এক নির্লিপ্ত সত্যদর্শী বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সাহায্যে জীবনের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সহানুভূতি অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই যথাযোগ্য পাত্রদের ওপর বর্ষিত হয়েছে। সহানুভূতি না থাকলে জীবনের শুধুমাত্র বহিরঙ্গ রূপ আর প্রতিক্রিয়ার বিবরণ হয়ত দেওয়া যায় কিন্তু পাত্র-পাত্রীদের ব্যক্তিত্বের সমস্ত স্তরগুলিকে উদ্ভাসিত করে তোলা যায় না। আর এই কারণেই এ উপন্যাসের সর্বত্র সূক্ষ্ম সৌন্দর্যবোধ, সংযম এবং সুস্থ শিল্পদৃষ্টির পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট।

এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এটাই যে পড়তে গেলে মনে হয় এটি যেন এক দীর্ঘ কবিতা—সেই রকমই বিচিত্র ভাবের সমন্বয়, একমুখী গতির তীব্রতা, সমগ্র বাতাবরণের একাগ্রতা, চিত্রকল্প যেন রূপে, বর্ণে, গন্ধে সব দিক থেকে সজীব হয়ে, সমগ্রভাবে হয়ে উঠেছে এক অসামান্য শিল্পকর্ম। কাহিনীর গতিবেগ সর্বত্র এক লয়ে চলেনি। প্রয়োজন বুঝে এমনভাবে বিভিন্ন লয়ের সমাহার ঘটানো হয়েছে যা সাধারণত কাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব। বিভিন্ন অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কাহিনীর মূলসূত্রটি যেন রকমারি বর্ণে রঞ্জিত হয়ে বিভিন্ন লয়ে বিচিত্র গতিছন্দে এগিয়ে চলেছে।

'উসকা বচপন'-এর ভাববস্তুর মধ্যে একটি অপূর্ব সংহতি দেখা যায়। কাহিনীর সূত্রকে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যা প্রাত্যহিক জীবনের মূর্ত স্তর এবং সংকেতধর্মী বিমূর্ত স্তর উভয় ক্ষেত্রেই বিচরণ করে যায় অবলীলাক্রমে। স্থূল ঘটনার বর্ণনার মধ্য দিয়েই তার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাটুকুও ধরে দিতে পেরেছেন লেখক। চরিত্র এখানে একক ভাবে একটি ব্যক্তিত্ব, আবার বৃহত্তর সত্তারূপে পরিবেশ স্বরূপ । তেমনই পরিবেশ শুধু এক মূর্ত ইন্দ্রিয়গোচর বাতাবরণ বা পরিস্থিতি মাত্র নয়, সেই সঙ্গেই তা যেন এক জীবন্ত ব্যক্তিত্বও। সমস্ত ঘটনা একটি ছোট ছেলের চেতনার স্তরে যেমনভাবে ধরা দিয়েছে তেমনি ভাবেই কাহিনীটি বিবৃত হয়েছে, কিন্তু তারই মধ্য দিয়ে এই রচনা জটিল গভীর বহুমুখী চেতনার স্তরকেই ছুঁয়ে গিয়েছে। সাদাসিধে বাস্তবধর্মী ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সমান্তরালভাবে যেন কোনও এক কাল্পনিক কণ্ঠস্বর কিছু কিছু রীতিবদ্ধ সংবাদ, ইঙ্গিতময় চিন্তা ও মন্তব্য এমনভাবে উচ্চারণ করেছে, যা অত্যন্ত গভীর কাব্যধর্মী ভাবনার মধ্যেই পাওয়া যায়। এই কাব্যধর্মী বক্তব্য-ভাবনা 'উসকা বচপান' উপন্যাসের কয়েক জায়গায় খুবই নাটকীয়ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে।

এই উপন্যাসে গতির প্রয়োগ বার বার এমনভাবে করা হয়েছে যা কাহিনীকে যথেষ্ট নাটকীয়তা দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে ভাবের অভিব্যক্তির এমন একটা স্তরে তাকে পৌঁছে দিয়েছে যাকে শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব। বীরুকে যেন ব্যবহার করা হয়েছে ক্যামেরার মতো, যে এক একবার এক এক পরিস্থিতির ছবি তুলছে—কখনও ক্লোজ-আপে, কখনও লং-শটে দৃশ্য তৈরি করছে। এইভাবে একদিকে রচনার মধ্যে বীরুর শিশুসুলভ অস্থির চঞ্চল অথচ সহজ সরলতামণ্ডিত মনটি উদঘাটিত হয়েছে, অন্যদিকে খুব সহজভাবে প্রত্যক্ষদর্শীর তাৎক্ষণিক দৃষ্টিতে ঘটনার প্রকৃত গুরুত্বকে বোঝানো সম্ভব হয়েছে। 'উসকা বচপন'-এর আর একটি বিশেষত্ব এর চিত্রময়তা। সংযত অথচ স্পষ্ট বিবরণ, সূক্ষ্ম সংকেত, বর্ণনার মাধ্যমে ঘটনাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তুলতে পারার ক্ষমতা, এই সবের মারফৎ কাহিনীর পরিস্থিতি এবং গূঢ় অন্তর্লোককে এমন জীবন্ত করে তোলা হয়েছে যা এই কাহিনীর কেন্দ্রীভূত প্রভাবকে চূড়ান্ত তীব্রতায় ধারণ করে রেখেছে আগাগোড়া।

এই কেন্দ্রীভূত প্রভাব এক গভীর বিষণ্ণতাবোধ এবং তীব্র অবসাদের অনুভূতি। আরও আধুনিক ভাষায় বলা চলে, মানুষের নিঃসঙ্গতাবোধ, জীবনের ব্যর্থতা আর অর্থহীনতার নিয়তি। এই সব সমস্যা যতই আধুনিক হোক না কেন, মনকে ব্যথিত তো করেই। কখনও কখনও মনে হয় তার ধোঁয়া, অন্ধকার আর নৈঃশব্দে দম বন্ধ হয়ে আসছে। এই ঘোর ঘনঘটাকে একটু হালকা করতে পারে এমন কোনও পরিস্থিতি এ উপন্যাসে নেই বললেই চলে। কোথাও কোনও সহজ স্নেহের সূর্যকিরণ, ক্রীড়ারত শিশুদের অবারিত হাসি, কিশোর প্রেমের মুগ্ধ-মদিরতা এসব প্রায় নেই বললেই চলে। দেবীর প্রেমের প্রসঙ্গটিও বড়ই কুণ্ঠাজড়িত, বিচিত্র অস্বাভাবিকতা ও মানসিক উদ্বেগে ভরা। কাহিনীর সমস্ত বাতাবরণটিই এই রকম।

লেখক আলো আর অন্ধকার মিলিয়ে-মিশিয়ে ছবি আঁকার চেষ্টা করেননি। তিনি অন্ধকারেরই বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন তীব্রতা আর চাপ মিশ্রিত করে এ কাহিনী বয়ন করেছেন। খাঁটি কালো রঙের বিভিন্ন মাত্রা ও গভীরতার সাহায্যে এবং কোথাও কোথাও সামান্য ফিকে রং মিশিয়ে খুব সূক্ষ্ম শিল্পবোধ ও অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে কাহিনীতে সমতা ও বিসদৃশতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেইজন্যই এই চিত্রে ধরা পড়েছে শুধু এক বিষণ্ণ অবসাদের অনুভূতি। জীবনের গভীর বিড়ম্বনা বা ট্র্যাজেডির ভাব এখানে সৃষ্টি হয়নি। শক্তির প্রবল সংঘাতও অনুপস্থিত, তাই জীবন এখানে কোনও প্রবল আঘাতে হঠাৎ ভেঙে পড়ে না, একটু একটু করে ঝুরঝুরে হয়ে গুঁড়িয়ে যায়।

কৃষ্ণ বলদেব বৈদ বড় সজাগ শিল্পী এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাঁর শিল্পকর্ম যেমন সুযোগ্য তেমনই চিত্তাকর্ষক। ভাষার গতি স্বচ্ছন্দ সাবলীল। উর্দুভাষায় তাঁর অধিকার যথেষ্ট। সে ভাষার প্রবাদ প্রবচন খুব দক্ষ ভাবেই তিনি ব্যবহার

করেছন নিজের রচনায়। ভাষাও কোথাও নীরস বা কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। এ ভাষা ওই ছোট্ট ছেলেটির মানসিক অবস্থার প্রকারভেদের উপযুক্ত হয়েই থেকেছে অথচ তার শৈল্পিক সূক্ষ্মতা হারায়নি। এই বিশেষত্বের জন্যেও 'উসকা বচপন' একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকৃতি।

নেমি চন্দ্র জৈন

এক

দাদী পড়ে রয়েছে চারপাইয়ের ওপর — ময়লা, কোঁচকানো, কুঁকড়ি সুকড়ি হয়ে, কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে কাঁপছে, ঠিক যেন গেঁয়ো লোকের ঢিলেঢালা করে বাঁধা একটা পোঁটলা, যে কোনও মুহূর্তে খুলে বুঝি ছত্রাকার হয়ে পড়বে।

চারপাইয়ের মাঝখানটাতে মুখ ঢেকে পড়ে রয়েছে, যেন ছোট্ট একটা বাচ্চা কাঁদতে কাঁদতে এই বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে, অথবা মরেই গেছে।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই যে দেউড়ির মতো জায়গাটা — তারই এক কোণায় রয়েছে চারপাইটা। অন্য কোণগুলো একেবারে খালি। যে কোণটায় চারপাইটা রয়েছে সেটাও বেশ ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে।

দেউড়িটা এ বাড়ির মুখ। কখনও খোলা থাকে, কখনও বন্ধ। যখন খোলা থাকে রান্নাঘরের ধোঁয়া বাইরের গলির দিকে বেরিয়ে আসে মুক্তি পাওয়া কয়েদীর মতো, কিন্তু তার গতি এতই ধীর যে সন্দেহ হয় মুক্তি পেয়ে সে বোধ হয় খুশি নয়। মনে হয় এই ধোঁয়া যেন বন্দী নয় আদৌ, বরং এ বাড়িরই বাসিন্দা। আর দেউড়ির দরজা বন্ধ থাকলে শয়তানের বাচ্চার মতো দেউড়ির মধ্যেই ঘুরপাক খেতে থাকে ধোঁয়াটা, ফলে, দাদী বেচারি কেশে কেশে সারা হয়ে যায়।

দেউড়ির দেওয়ালগুলোর জায়গায় জায়গায় চাপড়া খসে পড়েছে। কাঁচা পলস্তারার ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া ছোপগুলো যেন রুগীমানুষের ঠোঁটের ওপরকার শুকনো ছালের মতো। মেঝের ওপর কালো নোংরা কাদার মতো একটা স্তর পড়ে গেছে, খালি পায়ে হাঁটলে পায়ের সঙ্গে এমন সেঁটে যায় যে মনে হয় জুতো পরা রয়েছে। ছাদের কড়ি-বরগাগুলো ধোঁয়ায় কালো। সেখান থেকে লম্বা লম্বা কালো ঝুল এমন ভাবে ঝুলে থাকে ওগুলো যেন দেউড়ির অলঙ্কার।

এই দেউড়িটায় সমস্তক্ষণ কেমন একটা অদ্ভুত চাপা চাপা, স্যাঁৎসেঁতে ভাব বিশ্রি একটা উপদ্রবের মতো লেগেই রয়েছে। দাদীর নিঃশ্বাসের ঘড়ঘড়ানিও তারই একটা অঙ্গ।

দেউড়ির দরজাটা গলির দিকে। লোকের যাতায়াতের শব্দ শুনে দাদী আন্দাজ

করতে চেষ্টা করে কে কোন্ দিকে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোনও স্ত্রীলোক বা পুরুষকে ডাক দেয় কাছে আসার জন্যে। দাদীর কান খুব সজাগ। কিন্তু মায়ের কান আবার তারও ওপরে যায়। সব কাজকর্ম ফেলে দুপদাপ করে মা বাইরে ছুটে আসে, তারপর দাদী কাউকে কাছে বসিয়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আশীর্বাদ করছে দেখলে রেগে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে ফিরে যায়। সেই সময় দাদীর গলার স্বরও একেবারে নেমে যায়। মায়ের দৃঢ় ধারণা, দাদী পাড়ার লোকদের ডেকে ডেকে খালি মায়ের নিন্দে করে আর মায়ের বিরুদ্ধে ওদের উসকে দেয়।

এ রকম সময়ে মায়ের সামনে পড়ে গেলে বীরুর কপালে মার লেখা থাকে। দেউড়িতে দাঁড়িয়ে সে চোখ মোছে একটুক্ষণ, তারপর দাদীর আদর করার চেষ্টাকে এড়িয়ে বেরিয়ে আসে বাইরের গলিতে।

গলিটার ঠিক মাঝবরাবর একটা নালা — গাঢ় কালো কালির আঁকাবাঁকা একটা রেখার মতো বয়ে চলেছে। তার মধ্যে পোকা কিলবিল করছে, ভনভন করছে মাছি, উড়ে বেড়াচ্ছে গুচ্ছের বোলতা। সব সময় বেশ একটা জমজমাট ভাব। লম্বা একটা লাঠি নিয়ে বীরু নালাটার এখানে ওখানে খোঁচা মারতে থাকে। বোলতাগুলো উড়তে শুরু করে ভনভনিয়ে, আর সেই শব্দ শুনে মনে হয় বেশ চটে গেছে ওরা। বীরু তখন ঘাবড়ে গিয়ে মাথা নিচু করে দু'হাতের মধ্যে মুখটা আড়াল করে ফেলে। বোলতাগুলো আবার ফিরে যায় কাদার ওপর। বোধ হয় বোঝবার চেষ্টা করে এবার কী হবে।

সে এবার ঠোঁট টিপে চুপিসারে একটু এগোয় তারপর হঠাৎ একটা অন্যমনস্ক বোলতাকে লাঠির খোঁচায় কাদার মধ্যে ঠুসে দিয়ে একছুটে পালিয়ে যায় বাড়ির দিকে। বোলতাগুলো এবার ওর দিকে তেড়ে আসে বটে কিন্তু ততক্ষণে ও দেউড়ির দরজা বন্ধ করে ফেলেছে।

এই খেলাটা ওর ভারি প্রিয়। ও নেহাতই একটা বোকা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে। দাদীর চিটময়লা দুর্গন্ধ লেপের কাপড়টা জীর্ণ হয়ে প্রায় পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা হয়ে গেছে! জায়গায় জায়গায় হয়তো ছিঁড়েও গেছে সেটা। কিন্তু শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে দিবারাত্রি দাদী ওই লেপটা মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকে। সকাল-সন্ধ্যা সমস্তক্ষণ মাথা-মুখ সব ঢেকে এমন অদৃশ্য হয়ে থাকে যে বীরু অনেক সময় চিন্তিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। সাড়া না পেলে লেপ ধরে টানতে থাকে। তখন দাদী যদিও আপত্তি করে, কিন্তু তার গলা শুনেই বোঝা যায় দাদী রাগ করেনি, বরং আদার করেই বকছে। বীরুর চিন্তা দূর হয় এতক্ষণে।

লেপের মধ্যে ঢুকে দাদীর কোলের কাছে বসতে খুব ভালবাসে বীরু, লেপটার দুর্গন্ধে যেন নেশা লেগে যায় ওর। ফোকলা মুখে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে দাদী কি যে আওড়ায় কে জানে কিন্তু বীরু ক্রমশ ভারি মিঠে একটা গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়।

দাদী যে কি মন্ত্র জানে! বীরু চমৎকার সব স্বপ্ন দেখে, তার ঠোঁটের ফাঁকে উছলে ওঠে হাসির আভাস, মনে হয়, দাদীর কোলের মধ্যে যেন ফুল ফুটেছে।

হঠাৎ কেউ ওকে ধরে ঝাঁকিয়ে হাত ধরে টানে। স্বপ্নভরা চোখ খুলেই দেখে সামনে মা দাঁড়িয়ে। মুখের রঙিন হাসি মিলিয়ে যায়। ভয়ে মুখ কালি, ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মনে হয়, ও বুঝি জানতে চাইছে, 'আমার স্বপ্নগুলো কোথায় গেল মা?'

মা টেনে হিঁচড়ে বীরুকে নিয়ে যায় বাড়ির ভিতরে।

— ঐ নোংরার মধ্যে পড়ে থাকা! একশবার মানা করেছি ! কি পাস তুই ওখানে শুনি?

এক কথা একশবার বলা মা'র অভ্যাস।

— ওর কোলে কি যে মধু আছে জানি নে বাপু?

প্রতি কথায় একটা না একটা প্রবাদ বাক্য মা ঝাড়বেই।

— মরতে তোর কি আর কোনও জায়গা জোটে না?

মায়ের প্রতিটি বাক্যেই জীবন আর মৃত্যু সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর সব প্রশ্নের মোকাবিলা করার চেষ্টা।

— আমার কোল কি তোকে কামড়ায় না কি ?

মায়ের মুখ দিয়েই যখন মধু ঝরছে তখন কোলের কথা আর বলার কিছু দরকার আছে কি!

— কি মন্তরে যে ছেলেটাকে বশ করেছে কে জানে!

এটাই বোধ হয় মায়ের স্নেহের প্রকাশ।

— খবরদার বলছি, আর কোনও দিন যদি ওর কোলে উঠেছিস তো দেখবি!

শেষবারের মতো ওকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে গজগজ করতে করতে মা চলে যায় রান্নাঘরে, বাসনপত্র ওলট পালট করতে থাকে — দেশলাই খোঁজা হচ্ছে। সারাদিনে কতবার যে দেশলাই হারায়!

— কোথায় যে উড়ে যায় কে জানে! এই তো এখানে রাখলাম!

এখনও ওইখানেই রয়েছে, কিন্তু সামনে পড়ে থাকা জিনিসও দেখতে পায় না মা।

— কোথায় যে গেল...!

দেশলাইটার ওপর পা পড়েছে। মচ করে আওয়াজ হল। বীরু কিন্তু চুপ করেই আছে। বোধ হয় মায়ের ওপর শোধ তোলার ইচ্ছে।

— যা তো, বাজার থেকে একটা দেশলাই নিয়ে আয়।

গলিতে বেরিয়ে এসেই ওর চোখের জল শুকিয়ে গেল, ঠিক যেমন বাতাসে ঘাম শুকিয়ে যায়। ও পয়সাগুলো ছুড়ে ফেলে দেয় নালাতে। তারপর সেগুলো খুঁজতে গিয়ে নালার কাদা তোলপাড় করতে শুরু করে। একটু পরেই ভুলে যায় পয়সা খোঁজার কথা। নালাতে আরও ঢের ভাল ভাল জিনিস আছে। সেই সব

নিয়ে মশগুল হয়ে যায় ও। আপন মনে একটানা বকবক করে যায়। ওর গাল দুটোতে এতক্ষণে আবার ফোটাফুলের মতো খুশির ছটা। মনে হয় যেন হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নগুলো এই তো আবার ফিরে পেয়েছে সে।

দুই

উনুনের সামনে বসে মা খুব জোরে জোরে ফুঁ দিচ্ছে। ধোঁয়া যেন ভূতের মতো কুণ্ডলি পাকিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে সারা বাড়িতে। বাইরের দরজা বন্ধ। বেশ জোর একটা ফুঁ দিতেই ছাই উড়ল চারদিকে আর অমনি চোখ রগড়াতে শুরু করল মা।

— একেবারে ভিজে কাঠ। মা গজর গজর করছে। দাদীর ধারণা, মা রোজ সকালে উঠেই জল ঢেলে দেয় কাঠগুলোর ওপরে।

কাঠ উলটে পালটে দিয়ে আবার ফুঁ দিয়ে চলেছে মা। ধোঁয়াও উঠছে একই ভাবে। কটু তিক্ত বিষের মতো ধোঁয়া। প্রত্যেকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে যাচ্ছে গলার মধ্যে, বুকের ভেতর থেকে ঠেলে উঠছে কাশি, চোখ ভরে যাচ্ছে জলে। ধোঁয়া নয় তো, এ যেন কালো সাপ, প্রাণটা নিয়ে তবে ছাড়বে।

— কি ভিজে কাঠ।

সবাই কাশতে শুরু করেছে — মা, দাদী, ও নিজেও। দাদীর কাশিটাই সবচেয়ে শুকনো, সবচেয়ে কটু আর ভয়াবহ। কাশতে কাশতে দাদী কখনও শুয়ে পড়ছে, কখনও বা এক ঝটকায় উঠে বসছে, ফের মুখ ঢেকে একেবারে লুটিয়ে পড়ছে। দাদীর অবস্থা বেশ শোচনীয় তো বটেই আর তাকে দেখতে দেখতে বীরুর অবস্থাও প্রায় সে-রকমই হওয়ার যোগাড়।

— একেবারে ভিজে কাঠ রে।

জল ঝরছে মায়ের চোখ থেকেও। সে জলও নিশ্চয়ই নোনতা, কিন্তু সেজন্যে মায়ের প্রতি ওর বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগছে না। বরং ইচ্ছে করছে এগিয়ে গিয়ে মায়ের পিঠে এমন একখানা লাথি ঝাড়ে যাতে তার মাথাটা সোজা ঢুকে যায় উনুনের মধ্যে। সেই হবে উচিত শিক্ষা। আগুনও জ্বলে উঠবে, ধোঁয়া মরবে আর দাদীর কাশিও বন্ধ হবে।

ধোঁয়াটা যেন মায়ের সঙ্গী আর দাদীর শত্রু।

ও দু'পা এগিয়ে যায়। লাথি মারার ভঙ্গি করে বিড়বিড় করে কিছু বলেও।

তারপর দাদীর কাছে ফিরে গিয়ে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলে, দাদী, একটু জল নিয়ে আসব?

এতক্ষণে দাদীর কাশি একটু কমে এসেছে । ও কাশতে কাশতে মায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

— মা, দাদী জল চাইছে।

— জল চাইছে? হুঁ ! কানা নাকি, দেখতে পাচ্ছিস নে কাঠ নিয়ে কেঁদে মরছি? আমার তো আর চারখানা হাত নেই! যা বেরো, দুর হ' এখান থেকে। জল চাইছে!

ও ফিরে যায় দাদীর কাছে। বোধ হয় দাদীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যেই নিজেও দাদীর সঙ্গে কাশতে আরম্ভ করে। কাশির প্রতিটা দমকের সঙ্গে একটা করে গালাগাল বেরিয়ে আসছে দাদীর মুখ থেকে — ডাইনি! ... রাক্ষুসি! ... প্রাণটা নিয়ে তবে ছাড়বে! ... চোখ দুটো আগেই নিয়েছে! ... হে ঠাকুর! ...

নিজের মায়ের এসব নামকরণের সঙ্গে ও বেশ পরিচিত। বাড়িতে এই ধরনের আরও অনেক শব্দই প্রতিদিন উচ্চারিত হয়ে থাকে। ওর ঠিক মনে পড়ে না, কিন্তু সেই ছোটবেলার আধো আধো বুলির মধ্যে থেকে প্রথম যেদিন একটা শব্দ পরিষ্কার উচ্চারণ করতে পেরেছিল, সেই শব্দটা ছিল 'ডাইনি'। বাড়ির লোকে শব্দটা শুনে কিন্তু শিউরে ওঠেনি, বরং খুব হেসেছিল! সম্ভবত ওরা ভেবেছিল, শব্দটার এমন শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারাটা ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রমাণ। তারা যে ছেলেকে বেশ সুশিক্ষা দিতে পেরেছে এর জন্যে বোধ হয় মনে মনে গর্ববোধও করেছিল।

সেই সময় দাদী ওদের কাছে থাকত না। ওর মনেও পড়ে না সেই সব দিনের কথা। বাবা-মা অবশ্য মাঝে মাঝে তখনকার কথা আলোচনা করে, কিন্তু পুরনো দিনের কথা স্মরণ করে বসে বসে হাসি-গল্প করার অবসর, মন আর সময় কোনটাই তাদের নেই। কখনও পিছনে ফিরে তাকালে শুধু সেই সব ঘটনা তারা দেখতে পায় যেগুলোর কথা বলতে গেলে জিভ আরও ক্ষুরধার হয়ে উঠবে, মুখের ওপর অন্ধকার ছায়া ঘনিয়ে আসবে আর চোখ দুটো দেখাবে যেন ঠাণ্ডা হিম ছাই-এর ডেলার মতো।

এখন ওই সব শব্দের অর্থ ও জানে। ঠিক জায়গায় ঠিক মতো প্রয়োগও করতে পারে এমন কি। মা তো ডাইনিই। দাদীকে জলটুকুও দেয় না। ইচ্ছে করেই বাড়িতে এত ধোঁয়া করে। ভিজে কাঠের অজুহাত দেখায়। সব সময় সকলের সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে। রুটিগুলো একদম কাঁচা কাঁচা থাকে। বাবা তো প্রায়ই মাকে পেটায়। বুড়ির সেবা করে না একটুও। দাদীকে তো মেরেই ফেলতে চায়।

ও যে এত সব বুঝতে পারে তার স্পষ্ট প্রমাণ হল ওর এই অস্থির স্বভাব। কচি মুখের ওপর ক্ষণে ক্ষণে কত রকম ভাব খেলে যায়, মনের ব্যাকুলতা বেরিয়ে পড়ে কথায় কথায়, আর শিরাগুলো যেন দপদপ করতে থাকে। সব সময় কি বিষাদমগ্ন

মুখ। ঠোঁটে হাসি নেই, ঘরের কোণে বসে থাকে ... ওকে দেখলে হঠাৎ যেন বার্ধক্যের কথাই মনে পড়ে যায় — এমনই এক বার্ধক্য যার গোড়ায় কোন শৈশব ছিল না।

— জলে ভরা ভিজে কাঠ! নিজের ঠ্যাং দুটো গুঁজে আগুন জ্বালাব নাকি! একশ'বার বলেছি, শুকনো কাঠ আনবে। তা, এ-বাড়িতে আমার কথা কেউ কানে নিলে তো!

মায়ের গজগজানি ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে চমকে ওঠে ও।

— এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস শুনি? বাইরে যেতে পারিস নে? দেখতে পাস না কিছু? কানা নাকি? ধোঁয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, দাদীর জন্যে দরদ একেবারে উথলে উঠছে!

খুব ভয়ে ভয়ে ও তাকায় মায়ের দিকে। ... মা, তুমি ডাইনি নও, তুমি আমার লক্ষ্মী মা। দেখো আমি তোমাকে ঠিক শুকনো কাঠ এনে দেব, নতুন জুতো কিনে দেব, নতুন কাপড় এনে দেব — এখন এখান থেকে চলে যাও না লক্ষ্মীটি!

ওর সেই ভয়চকিত দৃষ্টি আর কাঁপা ঠোঁটের ভাষা পড়তে পারলে হয়তো মমতায় তার মায়ের চোখেও জল আসত আর মা চুপচাপ চলে যেত সেখান থেকে — আগুন নিজেই জ্বলে উঠত, ধোঁয়ার কুণ্ডলি যেত মিলিয়ে আর কাশির বদলে হাসি দেখা দিত দাদীর মুখে। মা এক গেলাস জল এনে ধরত দাদীর মুখের কাছে, দাদী জলটা খাওয়ার আগে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে আশীর্বাদ করত — জন্ম এয়োস্ত্রী হও বাছা, দুধে ভাতে থাকো, বাড়বাড়ন্ত হোক ...!

কিন্তু মায়ের ভিজে চোখ দুটো এখন অঙ্গারের মতো জ্বলন্ত।

— বুড়ি মরবেও না, আমাকেও নিষ্কৃতি দেবে না।

— ওফ ঈশ্বর!

— যেদিন থেকে এসেছে, সেদিন থেকে সুখ-শান্তি সব গেছে।

— হে দীনদয়াল!

— মিছে কথা কিভাবে বলতে হয় শিখতে হলে এঁর কাছে আসা উচিত।

— যে করবে তার যেন মরণ হয়।

— যে পাতায় খান সেই পাতাই ফুটো করেন।

— হে ঠাকুর, তুমি সব দেখছ!

— উঃ ভারি একেবারে ধর্মাত্মা এসেছেন।

ও দাঁড়িয়ে আছে সেইখানেই, এক কোণায়। একবার মায়ের দিকে দেখছে, একবার দাদীর দিকে। কখনও অস্থির চঞ্চল হয়ে উঠছে, আবার একটু পরেই শান্ত হয়ে যাচ্ছে। যখন অস্থিরতা জাগে, ওর শিরাগুলো ফুলে ওঠে শক্ত হয়ে, মাথার ভেতরটা যেন একেবারে ফাঁকা, শূন্য মনে হয়। তারপর যখন শান্ত হয়ে যায় তখন মনে হয় কেউ যেন শরীরের সমস্ত রস চুষে বের করে নিয়েছে।

হঠাৎ ওর নজর পড়ল মায়ের দিকে। দেউড়ির ধোঁয়াটে আলোয় মায়ের চোখ

দুটো ধকধক করে জ্বলছে। ও উদভ্রান্তের মতো চেয়ে থাকে সেই জ্বলন্ত চোখের দিকে। আর একটুক্ষণ যদি এখানে দাঁড়াতে হয় তাহলে ও নিশ্চয় চিৎকার করে উঠবে। কিন্তু চলে যেতে চাইলেও যে যেতে পারছে না সে। কাঁপা কাঁপা পা দুখানা কেউ বুঝি শিকল দিয়ে ওইখানেই বেঁধে রেখেছে।

— তুই এখান থেকে গেলি কি না? ধোঁয়ায় চোখ দুটো যদি অন্ধ হয়ে যায় তখন কি করব তাই শুনি?

তারপর কে জানে কেন মা হঠাৎ বসে কাঁদতে শুরু করে দেয়। হয়তো ধোঁয়ার জন্যেই চোখ দিয়ে জল পড়ছে — ও ঠিক বুঝতে পারে না। দাদীর নড়বড়ে দেহটার দিকে একবার তাকিয়ে এলোমেলো পায়ে বাইরে বেরিয়ে যায়।

বাইরে ছেলের দল খুব লাফালাফি হৈচৈ করছে। ওপর দিকে হাত তুলে তুলে আওয়াজ দিচ্ছে — ইনকিলাব জিন্দাবাদ!

— টোডি বাচ্চা হায় হায়! — হায় হায়! —হায় হায়!

কিছুক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে চোখ মুছতে থাকে ও। তারপর চোখ থেকে ঝরতে থাকা নোনতা জল জামার হাতা দিয়ে মুছে নেয়। চোখ দুটো জ্বালা করছে এখনও, কিন্তু মাথার মধ্যে যেটা চক্কর দিচ্ছিল, অনেকটা কমেছে এখন। আস্তে আস্তে ওর ঠোঁটের ওপর ফুটে ওঠে একটা দুর্বল হাসির রেখা। বাচ্চাদের চিৎকার করে দুয়ো দেওয়া শুনতে শুনতে হাসিটা আরও একটু ছড়িয়ে পড়ে। ও একছুটে তাদের দলে মিশে যায়। চোখ এখন শুকনো কিন্তু গালের ওপর জলের দাগ — কাগজের ওপর ধেবড়ে যাওয়া কালির দাগ শুকিয়ে গেলে যেমন দেখায় অনেকটা তেমনি। খেলতে খেলতে ও মাঝে মাঝে নিজের ঠাণ্ডা হাত দু'খানা চোখের ওপর রাখে, চোখের জ্বালা কমাবার জন্যে। গালের ওপরকার শুকনো জলের দাগগুলো ঘসে ঘসে মোছার চেষ্টা করে দু'একবার। তবু ওর গলার জোর অন্য ছেলেদের থেকে কিছুমাত্র কমে না। ওর হাসিখুশির মধ্যে ধোঁয়ার কালি কিভাবে যেন মুছে গেছে। আর পাঁচটা ছেলের মতোই মহা আনন্দে ও এখন খেলছে, লাফাচ্ছে, খিলখিল করে হেসে কুটিপাটি হয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ খেলাধুলোর পর ছেলেরা যে যার বাড়ি চলে যায়।

ওর নিজের বাড়ির দরজা বন্ধ। নর্দমার কাদার ওপরে বসে থাকা সোনালী রঙের বোলতাগুলোকে দেখতে থাকে ও, সেগুলো গোনার চেষ্টা করে। মনে মনে ফন্দি আঁটে কি করে বোলতাগুলোকে কাদার মধ্যে ফেলে ধরা যায়। হুলে সুতো বেঁধে বাতাসে বোলতা ওড়ানোর খেলা ওর ভীষণ প্রিয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লে নালার ধারে বসে পড়ে ও। একটা ঘাসের ডগা ছিঁড়ে তাই দিয়ে আঁচড় কাটতে থাকে মাটির ওপর। নজরে পড়ে একটা পিঁপড়ে, খেলতে শুরু করে দেয় সেটা নিয়ে। কখনও পিঁপড়ের যাওয়ার পথ আটকায়, কখনও সেটাকে উল্টে দেয়, কখনও আবার ঘাসের ডগার ওপর পিঁপড়েটাকে তুলে নিয়ে এক ঝটকায় ফেলে

দিয়ে আবার দু' আঙুলে তাকে ধরে তুলে আনে হাতের চেটোয়। ফুঁ দেয়। ধুলো উড়ে যায়, কিন্তু পিঁপড়েটা হাতের চেটোতেই সেঁটে থাকে। ও হাত ঝাড়া দেয়, কোথায় যে পড়ে যায় পিঁপড়েটা! হঠাৎ টের পায় খুব খিদে পেয়ে গেছে।

খিদের কথা মনে পড়তেই ওর মুখে ছায়া ঘনিয়ে আসে। এই মনে পড়াটা এক ঝটকায় ওর মনের ভেতরকার সব আলোগুলো যেন নিভিয়ে দিয়ে যায়। হাত থেকে ঘাসের ডগাটা খসে পড়ে। আনমনা ভাবে ও এসে দাঁড়ায় বাড়ির দরজায়। এখন দরজা একটু ফাঁক করা। আর সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়া। আর তার সঙ্গে মিশে ভেসে আসছে দাদীর কাশির শব্দ।

— দুপুর গড়িয়ে গেল বাছা, এখনও পেটে একটা দানাও পড়েনি। বুড়ো মানুষ, খিদের জ্বালায় কাতরে কাতরে এমনি করেই একদিন প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। আমাকে কি এইজন্যই এনেছিলে ওখান থেকে? ওকে একটু বোঝাও বাছা, আমার প্রাণটা নেওয়ার জন্যেই যেন একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে।

দরজাটা খুলে বীরু ঢুকে পড়ে বাড়ির মধ্যে।

— সকাল থেকে ইচ্ছে করে চারদিক ধোঁয়ায় ভরে দিচ্ছে। এই ধোঁয়ার জ্বালায় চোখ দুটো তো গেছেই, এবার একদিন দম আটকে মরতে হবে যে! ভগবান জানেন, কত জন্মের শত্রুতা ছিল ওর সঙ্গে।

বাবা দাঁড়িয়ে আছে দাদীর চারপাইয়ের পাশে। বগলের তলায় কাগজের বাণ্ডিল। একহাতে দোয়াত অন্য হাতে একটা থলে। বোধ হয় দুরে কোথাও কাজে গিয়েছিল এইমাত্র ফিরেছে। বীরু এগিয়ে গিয়ে থলের মধ্যে হাত ঢোকায়। অনেক সবজি এনেছে বাবা। একটা গাজর বের করে নেয় ও—গাজর খেতে ভারি মিষ্টি। দাদীর নালিশ ও মন দিয়ে শুনছে না। বাবার যেমন অভ্যেস, মাথাটা নিচু করে বসে পড়ল। বাবা একেই তো বেঁটে, তার ওপর মাথা নিচু করে বসার জন্যে আরও ছোটখাট দেখাচ্ছে। দাদী হাত বুলোচ্ছে বাবার পিঠে। কি জানি কেন, দাদী যাকে সামনে পায় তারই পিঠে হাত বোলায়। বাবা একেবারে চুপ করে বসে। বাবার মুখ বুঁজে থাকার ফল ভাল হয় না! হঠাৎ ফেটে পড়ে আর তখন যা কাণ্ড হয় ...

মা এসে দাঁড়িয়েছে সামনে। ওর গাজর চিবোনো বন্ধ হয়ে গেল।

— সারাটা দিন গালাগাল দিচ্ছে। এমন এমন সব খারাপ কথা বলে, শুনতে শুনতে আমার কল্‌জেটা একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেল বাছা। পাড়াপড়শি শুনে একেবারে ছি ছি করে। সবাই বলে, ধন্যি মানুষ তুমি—চুপচাপ এই সব সহ্য করছ! তা বাছা, প্রাণটা তো একটু একটু করেই বেরোবে, আমার কি দোষ বল দেখি, অ্যাঁ? আমার নিজের হাতে যদি থাকত তো আজই এই মুহূর্তে মরতাম আমি। কিন্তু...

ও তখন হাঁ করে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে চোখ বড় বড় করে। মা দাঁতে দাঁত ঘসছে। চাউনিতে যেন উদ্যত ছুরির ফলা, ঝিকিয়ে উঠছে। মনে হচ্ছে, মা যেন

একটা পেতনী! এই লম্বা লম্বা দাঁত, কুচকুচে ঘন কালো চুল, উলটো দিকে পা — নগ্ন বীভৎস একটা পেতনী।

— বল, বল, যত পারো নিন্দে কর। আমার দুঃখ শোনবার তো কেউ নেই!

— চুপ করে থাক্‌, কুত্তি।

গাজরটা পড়ে যায় ওর হাত থেকে, মুখটা আরও বেশি হাঁ হয়ে যায়। ওর দু'চোখে এখন দুনিয়ার সমস্ত ভয়, শরীর শক্ত কাঠ, গলা বুঁজে যাচ্ছে, চোখ দুটো যেন পাথর। ও একে একে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল, যেন কাঁদবে বলে অনুমতি চাইছে।

— ব্যস, শুরু হল আমার ওপর ঝাল ঝাড়া। ওঁকে তো কিছু বলবার সাধ্যি ...

— এখান থেকে যাও বলছি।

— কোথায় যাব শুনি? যাওয়ার মতো জায়গা থাকলে আর ভাবনা ছিল নাকি।

বাবা এবার একটা কুৎসিত গালাগাল দিল।

মা তালি বাজিয়ে বলে ওঠে — এক হাতে তো তালি বাজে না, দু'হাত লাগে।

বাবা কাগজের বাণ্ডিলটা ছুঁড়ে ফেলে দেয় মাটিতে।

— আমিও তো একটা মানুষ।

— তুই ... তুই ... তুই ... বাবার মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে রাগের চোটে।

— তুই কেন কষ্ট পাস বাবা। দোষ তো আমার! আমি যদি না থাকতাম ... কি করব, মরণও তো হয় না! ... যা, বাবা যা, সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, কত দূর থেকে এলি। যা এখন, কিছু খেতে দেয় তো খেয়ে-দেয়ে নে দেখি। আমার আর কি হবে! আরও কিছুদিন দুর্ভোগ আছে, সে একরকম কেটেই যাবে। ওই আহ্লাদীকে আর কিছু বলতে যাসনে। কেবল প্রার্থনা কর যেন ঈশ্বর আমাকে ...

— ওঃ ভারি আমার ঈশ্বরওয়ালি এসেছেন!

— তুমি ভেতরে যাবে কি না?

— আমার কি একটা কথা বলারও অধিকার নেই? আমি এ বাড়ির চাকরানি তো নই?

— আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা বলছি।

মা আপন মনে গজগজ করতেই থাকে কিন্তু সেখান থেকে নড়ে না। খুব জেদি মেয়ে মা! বেশ জানে, বাবা চটে গেছে। উঠলে এমন মার লাগাবে যে যদি ক্ষমতা থাকত, এক্ষুণি ও মাকে ঠেলেঠুলে অন্দরে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে একেবারে দরজা বন্ধ করে দিত।

— মায়ের কথাগুলো তো দিব্যি মন দিয়ে শোনা হল, তার বেলা তো কই বাবুর রাগ হল না! আর আমি কথা বললেই ... আমিও তো কারও মেয়ে, না কি! না হয় বাপ-মা মরেই গেছে, তা —

— হারামজাদি!

— ব্যস! আমার কপালে শুধু এই সব ...

— শুয়োরের বাচ্চি!

— আমার জন্যে শুধু ...

— কুত্তি!

দাদী কাশতে শুরু করেছে।

— যা বলছি, এখুনি উনুন জ্বালা!

— নিজের মুণ্ডু দিয়ে জ্বালাব না কি ? কাঠ তো একেবারে ভিজে।

— থলেতে কি আছে গো বাবা? বীরু জানতে চায়।

— ছাই!

মনে হল যেন বাবা ওর গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়েছে। গাল দুটো লাল হয়ে উঠেছে ওর। এক মুহূর্ত চতুর্দিক একেবারে নিস্তব্ধ। এটা কি বাড়ি না নরক! বাবা পাগলের মতো চেঁচাতে চেঁচাতে এগোচ্ছে।

— মারো, আরও মারো, মেরে ফেল একেবারে!

মাকে মার খেতে দেখে ওর সারা শরীর যেন এলিয়ে পড়ে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে ও। গাজরের টুকরোগুলো গলায় আটকে যাচ্ছে। দম আটকে আসছে ওর । কিন্তু দৃষ্টি বাবা আর মায়ের ওপর স্থির। মা চিল-চিৎকার করছে,—আরও, আরও মারো, একেবারে মেরে ফেল। আর বাবাও এলোপাথাড়ি মেরেই চলেছে।

— কেন হাত ব্যথা করছিস বাবা? মেরে-ধরে কি স্বভাব বদলানো যায়!

দাদী এই কথা বলেই লেপমুড়ি দিয়ে মাথা মুখ সব ঢেকে ফেলে। বাবাটা যেন একদম জংলি। কাঁদতে কাঁদতে ও চেঁচিয়ে ওঠে — বাবা, মা যে মরে যাবে!

মা-ও কিন্তু বেশ বোকা। মার খেতে খেতেও সমানে কথা বলেই যাচ্ছে। ও এবার চেঁচিয়ে মাকে বলে, মা, চুপ করে থাক না!

কিন্তু মা'র মুখ বন্ধ হওয়ার নয়। ও বাবার হাত ধরবার চেষ্টা করে কিন্তু ওর হাত দু'খানা বাবার হাঁটুর একটু ওপর পর্যন্তই পৌঁছয় মাত্র। বাবা এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে মায়ের চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় রান্নঘরের দিকে।

ও এবার মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে অসহায় ভাবে। কে জানে, কতক্ষণ বাদে ওর হুঁশ ফেরে। তখন দেখে, ও শুয়ে আছে মায়ের কোলে। মা কাঁদছে আর বাবা এক কোণে দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকছে। তার দৃষ্টি মেঝের দিকে। মাঝে মাঝে নিজের হাত দুখানা মেলে ধরে এমন ভাবে দেখছে যেন কিছু লেখা আছে সেখানে!

চোখ বন্ধ করে ফেলে ও। দাদীর লেপের মধ্যে থেকে রামনাম শোনা যাচ্ছে একটানা। কিন্তু সেই শব্দ বা মায়ের কান্না কোনও কিছুতেই এ বাড়ির আবহাওয়ায় কোনও পরিবর্তন হয় না। বাড়িটা যেন অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে একটা মন্দির, যেখানে একজন পুজারি কাঁদছে আর অন্যজন তাকে চুপ করাতে চেষ্টা করছে। বাবা বোধ হয় এই মন্দিরের শুধুমাত্র একটি মূর্তি।

তিন

দরজার চৌকাঠের ওপর বসে মাথা চুলকোচ্ছে দাদী। উসকো-খুসকো চুলগুলো যেন শুকনো হলদে হয়ে যাওয়া ঘাসের একটা ছোটখাট পাখির বাসা, যেটা কোনও ছোট ছেলে তছনছ করে দিয়ে গেছে।

— বাবা একবার যা দেখি, জলালপুরণীকে একটু ডেকে আনগে তো। সেই সক্কাল থেকে মাথার মধ্যে সমানে কুটুর কুটুর করে চলেছে।

জলালপুরণীকে দেখলেই বীরুর হাসি পায়। সব সময় হাসি লেগেই আছে জলালপুরণীর মুখে। ওই তো গোনাগুনতি কটা দাঁত, হাসলেই সেগুলো এমন নড়তে থাকে যে মনে হয় এক্ষুনি বুঝি সবকটাই পড়ে যাবে। মা বলে জলালপুরণী গতজন্মে কুত্তি ছিল।

—যা না বাছা, ওকে গিয়ে বল, একবার এসে মাথাটা ভাল করে বেছে দিয়ে যাক। উকুন একেবারে থিকথিক করছে।

জলালপুরণীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এসে বীরু দেখল মা দেউড়িতে এসে হাজির। দাদীর ওপর খুব চোটপাট করছে। জলালপুরণীকে সঙ্গে আসতে দেখে মা একেবারে অগ্নিমূর্তি। ওর সঙ্গে আজকাল মায়ের কথাবার্তা বন্ধ।

— কোথায় গিয়েছিলি তুই?

ও কোনও উত্তর দেয় না।

— বলি, কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি?

— ওকে বকছ কেন? আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি পাঠিয়েছিলাম।

— তোমাকে জিজ্ঞেস করবে আমার পায়ের জুতো!

— রাম, রাম, ছি ছি।

জলালপুরণী মায়ের মেজাজ দেখে দাদীর কাছে আর দাঁড়ায় না। কোথায় যেন চলে যায়। কিন্তু মাকে ফাঁকি দেওয়া অত সহজ নয়। বীরুকে টানতে টানতে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে জোরে জোরে ওর কান মুলে দিয়ে মা বলে — আর কখনও যাবি ওই শাঁকচুন্নিটার বাড়ি? বল্?

— দাদী পাঠাল যে। দাদীর মাথায় কুটুর কুটুর করছে কিনা!

— ওর মাথায় পোকা পড়ুক, তোর তাতে কি? আর কোনও দিন যাবি ও-বাড়িতে বল?

'না' বলে দিলেই নিষ্কৃতি পেয়ে যেত, কিন্তু কানের যন্ত্রণায় বীরু কোনও কথাই বলতে পারল না। মা কান দুটো ছাড়তেই ও দৌড়ে দেউড়িতে ফিরেই দাদীকে প্রশ্ন করে, জলালপুরণী গেল কোথায়?

— কে জানে কোথায় গেল বেচারি। দাদী এমন ভাবে বলে যেন জলালপুরণী একটা ছোট্ট খুকি, ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেছে। ঠিক তখনই দেখা গেল দাঁত বের করে, আঁচল সামলাতে সামলাতে হেলেদুলে জলালপুরণী আসছে। দাদী ওর পায়ের শব্দ চেনে।

— তোর ছেলেপুলেরা বেঁচে থাক। আজ সকাল থেকে মাথাটা এত কুটকুট করছে, একবার একটু দেখ দেখি ...

— একবার কেন, একশবার দেখতে পারি, কিন্তু তোমাদের বৌমাটি যে ...

— আরে, ও তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি? তুই বোস তো!

উকুন বাছাটা তো একটা ছুতো। আসল উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই মায়ের নিন্দে করা। জলালপুরণী দাদীর পিঠের দিকে বসে শণের নুড়ির মতো সেই পাখির বাসা চুল হাঁটকাতে থাকে। বীরু বসে পড়ে দাদীর সামনে, দাদী আঙুল দিয়ে ওর মাথার চুলে বিলি কাটছে। ও মাথা নিচু করে হাত পেতে বসে থাকে উকুনের প্রতীক্ষায়, এখনই সেগুলো বেরোবে দাদীর মাথা থেকে। 'এই দেখ মসি, মকাই-এর দানার মতো মোটা একটা উকুন' বলবে জলালপুরণী, 'তোমার শরীরে আর কি কিছু আছে গো? এই উকুনগুলো তো তোমার সব রক্ত চুষে খেয়েছে।' দাদী একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, 'রক্ত কি আর আছে রে মেয়ে! রক্ত তো সব উনিই চুষে খেয়েছেন।' বীরু এদিকে আপন মনে আউড়ে চলেছে, কুটুর কুটুর, কুটুর! ওটা যেন উকুন মারার মন্তর।

— তোর মঙ্গল হোক। কি কথাই বললি তুই।

— দাদী আমাকে উকুনদের গল্প বল না।

দাদী কিন্তু এখন নিজের কথা নিয়েই ব্যস্ত। মায়ের নিন্দে হচ্ছে, আর জলালপুরণী তাতে নুন-লঙ্কার ফোড়ন দিচ্ছে। এই গুজগুজ ফুসফুস যদি মায়ের কানে যায় তাহলে খুব বিপদ হবে। কথাটা মনে হতেই ও চটপট উঠে বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়।

মা বাসন মাজছে।

— কে বসে রয়েছে ওর কাছে?

— কেউ না।

— মিথ্যে কথা বলছিস?

— ভগবানের দিব্যি!

— তাহলে কথা বলছে কার সঙ্গে?

— নিজের মনেই বলছে।

মা নিশ্চিন্ত হল। বীরু জল না খেয়েই আবার চলে গেল বাইরে। বাড়ির সব সমস্যা যদি এমনই একটু আধটু ছোটখাট চালাকি করে সামাল দেওয়া যেত ...

দাদী আর জলালপুরণী মহা উৎসাহে ফুসুর ফুসুর করছে। বীরু কিছুক্ষণ ওদের সামনে এমন একটা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে যেন কোনও গভীর সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে। একটু পরেই বাসনের পাট চুকিয়ে মা বাইরে আসবে আর জলালপুরণীকে দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠবে। ওর মিথ্যে কথাও ধরা পড়ে যাবে। মা আর জলালপুরণীতে তখন ধুন্ধুমার বেধে যাবে একেবারে। পাড়ার মেয়েরা সব বেরিয়ে আসবে তামাশা দেখতে। জলালপুরণী হাত নেড়ে নেড়ে বলবে,'তুই যদি ভাল মেয়ে হ'স তো দিন রাত নিজের বরের হাতে ঠ্যাঙানি খাস কেন শুনি? শাশুড়িকে তো শূলে চড়িয়ে রেখেছিস। মেয়েকে তো বাড়িতে টিকতে দিসনে। পাড়ার কারও সঙ্গে তোর বনে না। লজ্জা বলে যদি কিছু থাকে তোর, তাহলে হাঁটুজলে ডুবে মরগে যা! ... মা কিছুক্ষণ পর্যন্ত এই রকম সব হাড় জ্বালানো কথার জবাব দেবে, তারপর ছোট বাচ্চার মতো কাঁদতে বসবে। এরপর বেশ কয়েকদিন পাড়ার ছেলেরা ওকে ক্ষ্যাপাবে এই কথা বলে, — তোর মা কাঁদে! তোর মা কাঁদে!

ওর ছোট্ট মাথায় এত কিছু হয়তো খুব স্পষ্ট ঢোকে না। কিন্তু ওর কচি মন এই পরিস্থিতির জটিলতা অনুভব করে। তা না হলে ও হঠাৎ এগিয়ে এসে দাদী আর জলালপুরণীকে মিছিমিছি এ কথা বলত না যে, মা আসছে।

জলালপুরণী চট করে উঠে দাঁড়ায়। দাদী তার শালোয়ারের পা ধরে টেনে বসাতে চেষ্টা করে। কিন্তু জলালপুরণী না না করতে করতে বেরিয়ে যায়।

এই দ্বিতীয়বার নিজের চালাকিটা ফলে গেল দেখে ও ভারি খুশি হয়ে হাততালি দিয়ে লাফাতে লাফাতে বাইরে গলিতে বেরিয়ে পড়ে, যেন মস্ত একটা যুদ্ধ জয় করে ফেলেছে।

গলিতে ছেলেরা হল্লা করছে। সবাই একসঙ্গে কথা বলছে, ঝগড়া করছে। একটা কিছুর মীমাংসা করতে চাইছে। ওদেরও কিছু সমস্যা আছে, ওদের সীমিত জগতের ছোটখাটো কোনও সমস্যা। এদের মধ্যে জলালপুরণীর বাচ্চারাই সংখ্যায় বেশি। ওদের সঙ্গে খেলতে মানা করেছে মা।

একপাশে দাঁড়িয়ে ও ছেলের দলকে এমন ভাবে নিরীক্ষণ করে যেন ও তাদের থেকে বয়সে অনেক বড়। ঠিক বুঝি এক প্রবীণ মানুষ পথ চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ে বাচ্চারা কেমন ভাবে খেলা করে তাই দেখছে! যেন নিজের সঙ্গে তুলনা করছে ওদের, জানতে চাইছে, 'তোমরা খেল কেমন করে?'

ও কি সত্যিই কেবলমাত্র একটা ছোট্ট বাচ্চা ছেলে?

চার

— দেবী আর রঘুপত আসছে আজ রাতের গাড়িতে। দেবী ওর বড় বোন, কিন্তু রঘুপত কে, কে জানে!

— আসছে তো আমি কি করব? নেচে উঠব? আমি তো বলেই দিয়েছি রাতের জন্যে ঘরে একছিটে আটাও নেই, তখন আবার আমার ওপর মেজাজ দেখাতে এস না।

কিন্তু রঘুপতটা কে?

— এত তাড়াতাড়ি আটা শেষ হল কি করে শুনি?

— শেষ হয়নি তো আমি খেয়ে ফেলেছি নাকি?

বাবার কপালটা কুঁচকে গিয়ে মোটা মোটা কতগুলো রেখায় ভরে গিয়ে জালের মতো দেখতে লাগছে।

— ঘি-ও ফুরিয়ে গেছে।

ওর চোখে যে প্রশ্ন ফুটেছিল তা ক্রমে ঝাপসা হয়ে এল। বোধ হয় ভাবছে, রঘুপত যেই হোক না কেন, ওর কিছু যায় আসে না।

— জলও নেই।

ও এবার মায়ের দিকে দেখতে থাকে। বাবার থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে মা কি কি জিনিস বাড়িতে নেই তার ফর্দ শুনিয়ে চলেছে। বাবা শুনছে আর তিড়বিড়িয়ে জ্বলছে।

— কেরোসিনও নেই।

— কি আছে শুনি?

— কত দিন থেকে তো বলছি। আমি কি করব? নিজের পেট থেকে বের করব?

— না, তা কেন, আমার মাথা থেকে করবি।

এই সংলাপের ভাষা বোঝার চেষ্টায় ও নিজের প্রশ্নটাই ভুলে গেল।

— ধমক দিলেই তো আর আমি নিজে আটা হয়ে যেতে পারব না। কাঠগুলো

ভিজে, দেশলাই পর্যন্ত নেই। কত দিন ধরে চেয়ে-চিন্তে কাজ চালাচ্ছি। যা করতে হয় এখনই কর, নইলে সেই তখন আমার প্রাণ বার করে ছাড়বে। আমার যা বলবার বলে দিলাম, হ্যাঁ!

বাবা আপনমনেই বিড়বিড় করে কি সব বলছে! এই রকম বিড়বিড় করতে করতেই যদি বাইরে বেরিয়ে যায় তো কত ভাল হয়।

— কানে তুলো গুঁজো থাকলে তো চলবে না। বলছি ...

— বল বল শুনি কি বলতে চাস তুই?

— আমার বকবক করার দরকার কি! তোমার যা মন চায় কর। যা বলার শুধু বলে দিলাম।

— ভগবানের দিব্যি, আর জ্বালাসনে আমাকে! কারও কাছে ধার করে আজ চালিয়ে দে, কাল কোথাও থেকে পয়সার যদি জোগাড় হয়ে যায় তো ...

বাবা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে থাকে।

— ওই কাল যে কবে আসবে তা কে জানে! কোথা থেকে ধার নেব, কেউ দেবে না। হুঁঃ, ধার নিয়ে নাও! কি কথা !

— পাড়ার কারও সঙ্গে তো সদ্ভাব নেই বাছা! দাদী বোধ হয় এতক্ষণ সুযোগ খুঁজছিল ফোড়ন দেবার জন্যে।

— তোমার তো সবাই খুব আপনার জন, তুমিই যাও না, চেয়ে নিয়ে এস।

— খবরদার যদি আমার আপনার জনেদের নাম করবি! জিভ টেনে ছিঁড়ে নেব একেবারে।

— ব্যস, মা বেটায় একজোট হয়ে গেলেন!

— তুই একটা গাধা, একেবারে গাধা!

বাবা দেউড়ির দরজায় দিকে এগোয়। বীরু নিজের দৃষ্টি দিয়ে যেন পিছন থেকে ঠেলে দিতে চায় বাবাকে।

— ঠিক আছে, সন্ধে পর্যন্ত ওই জুড়িওয়ালার সঙ্গে টো টো করে ঘুরে এস। রাত্তিরবেলা আকাশ থেকে আটার বৃষ্টি হবে'খন! জুড়িওয়ালা বাবার এক শিখ বন্ধু। মা দারুণ চটা তার ওপরেও। বাবার সব কিছু বদ অভ্যাসের জন্যে তাকেই দায়ী করে, তার বৌকে মা নিজের পরম শত্রু ভাবে।

— আটার জন্যেই কাঁদতে যাচ্ছি।

— নুন লঙ্কার জন্যেও পয়সা চাই, শুনতে পেয়েছ তো?

— শুনেছি, শুনেছি, শুনেছি।

— হায় হায় রে, কথার কি ছিরি।

বাবা হাতখানা একবার কপালের কাছে তুলে একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। এই মুহূর্তটা অন্তত মা যদি চুপ করে থাকতে পারে ...

— ওই সব কথায় ভয় পাওয়ার মেয়ে আমি নই। কি এমন বলেছি শুনি?

বাবা মাথা চাপড়াতে শুরু করে।

বাবা-মা'র বেশির ভাগ ঝগড়ারই শেষ দিকটা এই রকম হয়।

— যদি কিছু বলেও থাকি, আমি কি কথা বলতেও পাব না? কার কাছে চাইব? কাকে বলব? কি করব আমি বলতে পারো? দরকারের সময়ও চুপ করে মুখ বুজে থাকতে হবে?

— এবার থাম বাবা, আর কত খোয়ার করবি নিজের?

— তুমি যাও এখান থেকে, আটার ব্যবস্থা আমি করব।

—এ আমাদের দুজনের প্রাণ নেওয়ার জন্যে একেবারে কোমর বেঁধে লেগেছে। তুই এবার চুপ কর বাবা।

বাবার কপালটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। নিজের হাতের দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে বাবা ঠিক মনে হচ্ছে যেন কোনও চিঠি পড়ছে। বীরুর হাত, পা, কান, মন-প্রাণ, মস্তিস্ক সব থরথর করে কাঁপছে। বাবার পাগড়িটা গুটিয়ে তুলতে তুলতে ওর মনে হচ্ছে যেন কেউ ওর চোখের মণি দুটো উপড়ে তুলে ফেলে সেই জায়গায় দুটো জ্বলন্ত কয়লা গুঁজে দিয়েছে। ওর হাত থেকে পাগড়িটা ছিনিয়ে নেয় বাবা। টকটকে লাল কপালের ওপর কয়েকটা শিরা মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে আর দপদপ করে লাফাচ্ছে ছোট ছোট মাছের মতো। মুখের ওপর যেন কেউ হলুদ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়েছিল, সেই হলুদ এখন ঘামের সঙ্গে মিশে গলা আর ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। কাঁপা হাতে পাগড়ির এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মেপে নিয়ে কোনও মতে উলটে পালটে সেটা মাথায় জড়াতে শুরু করে। কেবলই খুলে খুলে যাচ্ছে পাগড়িটা, আর কতক্ষণ ধরে মাথা নিচু করে বাবা পাগড়ি বেঁধেই চলেছে। বাইরে থেকে কেউ নাম ধরে ডাকতেই বাবা বাইরে চলে যায় পাগড়ি জড়াতে জড়াতে।

বাবা দেউড়ির বাইরে পা দিতেই মা বলে ওঠে — বদ লোকের সঙ্গীগুলোও সব বদ।

— ডাইনি আবার কার পেছনে লাগে দেখ এখন! দাদী হাঁটুর ওপর মুখ রেখে মন্তব্য করে মাকে শোনানোর উদ্দেশ্যে।

— খবরদার, ফের যদি আমাকে গালাগালি দিস তো ...

— একজনকে তো জ্বালিয়ে পুড়িয়ে তাড়ালে বাড়ি থেকে, এবার বুঝি আমার পালা?

— তোমারই দয়ায় তো এত কাণ্ড হল!

— আবার আমাকে দোষ দেওয়া কেন? ওরে পাপের ঢেঁকি, একদিন তো তোকেও ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হবে রে, সে খেয়াল আছে?

— যে দিন থেকে এসে জুটেছে সেদিন থেকে বাড়িতে একটা দানাও থাকে না।

— থাকবে কেমন করে? তোর মতো অলক্ষ্মী যে সংসারে আছে সেখান থেকে

সব জিনিসই উড়ে-পুড়ে যায়। অন্য কিছুর কথা ছেড়েই দে, ঘড়ায় জলটুকু পর্যন্ত থাকে না। আহা গো, ছেলেটা আমার সকাল থেকে উপোসী ...

— তোমার ছেলেটা। ... এমন ভাবখানা, যেন সে আমার কেউ নয়!

এবার শুরু হল যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্ব। অন্তরের বিষ কটু তিক্ত শব্দের রূপ নিয়ে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, গালাগাল হয়ে ছুরির মতো কেটে ফেলছে, অপমান হয়ে বিঁধে যাচ্ছে ভেতর পর্যন্ত। ও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে সেই বিষ হজম করার চেষ্টা করল ভেতরে ভেতরে, তারপর হনহনিয়ে বেরিয়ে গেল। নালার ধারে বসে আস্তে আস্তে কাঁদল কতক্ষণ ধরে। ভয় আর মনের ভার অনেকখানি কান্না হয়ে বেরিয়ে গেল। ভেতরটা যেন হাল্কা, খালি হয়ে গেছে। ও বসে বসেই ঢুলতে শুরু করে তারপর ঢুলতে ঢুলতে গড়িয়ে পড়ে মাটিতে। হঠাৎ তখন ওর মুখ দিয়ে একটা গালাগাল বেরিয়ে আসে। এ গালিটা কোনও সময় বাবা দিয়েছিল মাকে, অথবা মা দাদীকে, কিংবা দাদী মাকে, নয় তো মা নিজেই নিজেকে।

চাচা রঘুপত দাদীর চারপাইতে বসে আছে মাথা নিচু করে। দাদী ধীরে ধীরে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছে। মাঝে মাঝে কপালে চুমো খাচ্ছে, কখনও বা চোখ মুছছে। অন্ধকারে রঘুপত চাচাকে ঠিক বাবার মতোই লাগছে দেখতে।

— আমি এখানে বড় কষ্টে আছি বাবা, খুবই কষ্টে আছি। আমার কপালে এত দুর্গতি ছিল, ভগবান যেন শত্রুরও কপালে অত দুঃখ না দেন। এখানে এসে আমার অবস্থা তো পথের খড়কুটোরও অধম হয়ে গেছে। এই নরক থেকে আমাকে নিয়ে চল বাবা!

চাচা রঘুপতের মাথাটা আরও ঝুঁকে পড়ে, আঙুল দিয়ে মেঝেতে আঁচড় কাটতে থাকে সে।

— প্রতিটি জিনিসের জন্যে কাতরে মরতে হয়। সময় মতো দু'খানা রুটিও জোটে না। যখন জোটে, সে এমন রুটি যা ভগবান ভিখিরিকেও যেন না দেন। এত দুর্দশা শত্রুরও যেন না হয়! শুকনো রুটি খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল বাবা ... সারাদিন ধোঁয়ায় ঘর ভরা, চোখ দুটো তো নষ্ট হয়ে গেছে। আর আমি এখানে থাকব না বাবা!

বীরু দাদীর লেপ থেকে বেরিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

— এই ছেলেটাকে ভগবান দীর্ঘজীবী করুন। এ না থাকলে এ বাড়িতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে মরতাম।

বীরু বাড়ির মধ্যে চলে যায়। রান্নাঘরে বাবা আর মা নিজেদের মধ্যে গজরাচ্ছে। মা কিছু বলছে, সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠে বাবা মায়ের বিনুনি ধরে দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে উঠছে — গলা দিয়ে যদি একটা আওয়াজ বেরোয় তো এখনই এই মুহূর্তে গলা টিপে শেষ করব! ও চটপট আবার ফিরে যায় দেউড়িতে।

— নিজের চোখেই দেখ বাবা, রাক্ষুসিটা বাড়িটাকে যেন পাগলা গারদ করে তুলেছে!

ও আবার ফিরে যায় অন্দরমহলে।

— এই বলে দিচ্ছি, একেবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক, না হলে ... বাবা মায়ের হাত এমন ভাবে মুচড়ে দেয় যে মা আর্তনাদ করে ওঠে।

ও আবার ফিরে যায় দেউড়িতে।

— আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে বাছা, যদি আমাকে বাঁচাতে চাস তবে ...

—দেবী কোথায়?

বাড়ির মধ্যে থেকে একটা চাপা চিৎকার দেউড়িতে এসে পৌঁছেই থেমে যায়।

—দেবী আবার কোথায় গেল?

এই পরিস্থিতি থেকে পালাবার একমাত্র উপায় যেন ওই প্রশ্নটা। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার অজুহাতে ও বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

— বীরু ! পিছু ফিরে দেখে বাবা ওকে ইশারায় ভেতরে ডাকছে। রান্নাঘরের এক কোণে মুখ ঢেকে পড়ে আছে মা।

— মায়ের কি হয়েছে?

— নাখুর দোকান থেকে দু'সের আটা নিয়ে আয় তো!

— মায়ের কি হয়েছে বাবা?

— কিছু হয়নি। তোকে যা বলা হচ্ছে তাই কর।

— পয়সা? ও হাত বাড়িয়ে বলে, যেন মায়ের হয়ে বলছে।

— পয়সা নেই। ধারে আনবি।

ওর গায়ে যেন বরফের হিমশীতল ছোঁয়া।

— এই নে কাপড়, এইতে বেঁধে আনবি।

ও কাপড়টা হাতে নেয়, কিন্তু তারপরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

— যাবি তো?

দাদীর চারপাইয়ের পাশ দিয়ে যেতে যেতে কানে আসে—

— বাপ আমার, ভগবানই শুধু জানেন, আমি এখানে কি করে বেঁচে আছি।

পথে বেরিয়েই ভগবানের উদ্দেশ্যে একটা খারাপ গালাগাল দিয়ে ফেলেই ভয় পেয়ে যায় বীরু। বাড়িতে কিছু ফুরিয়ে গেলে ওকেই যে কেন এদিক-ওদিকে চাইতে পাঠানো হয়, — এরা নিজেরা যেতে পারে না? ওদের লজ্জা করে, আর ওর বুঝি লজ্জা করে না? মা তো প্রায়ই বলে, 'যাকে চাইতে হয় তার মরণ ভাল ...'

ওর ইচ্ছা করে, হাতের কাপড়খানা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলতে। ও আবার মুখ ফিরিয়ে তাকায় বাড়ির দিকে। বাবা দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। আপনা থেকেই ওর পদক্ষেপে দ্রুত হয়ে ওঠে।

নাখু দোকানের সামনে বসে হুঁকো হাতে তামাক খাচ্ছে। তার হলদেটে

গোঁফজোড়া প্রতিবার টানের সঙ্গে সঙ্গে কুঁচকে উঠছে আবার ছড়িয়ে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় গোঁফজোড়া বুঝি নাখুর নয়, হুঁকোটার। ওর টিকিটা সদাই 'অলিফ' অক্ষরের মতো উঁচু হয়ে থাকে আর একখানা হাত ধুতির মধ্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কি যেন নাড়াচাড়া করে। লোকে ওর নাম দিয়েছে নাখু শের। ওর গলার স্বর সব সময়ই কেমন ভাঙা ভাঙা। তাই কম কথা বললেও ও যখন গর্জন করে ওর গলাটা ফুলে যেন দ্বিগুণ হয়ে ওঠে। গোঁফজোড়া আর টিকিটা নাচতে থাকে, হাতখানা কখনও ধুতির বাইরে কখনও ভেতরে যাওয়া আসা করতে থাকে। প্রতিটি খদ্দেরের সঙ্গেই ওর ঝগড়া হয়। বাচ্চারা ভেংচি কাটে ওকে দেখলে। যুবকেরা ওকে ক্ষেপিয়ে মজা দেখে। বৃদ্ধেরা বোঝে, লোকটার মাথাটা একেবারেই গেছে। ওর খদ্দের বেশির ভাগই প্রধানত মেয়ে, তারা অবিশ্যি ওকে গ্রাহ্যই করে না। নাখু একটা কথা বললে তারা উল্টে দুটো শুনিয়ে দেয়। খোলাখুলি বলে দেয়, নাখুটা বেইমান, ওজনে কম দেয়, হিসেবে হেরফের করে। কিন্তু তবু ওর দোকানেই আসে সবাই। একটু কথা কাটাকাটির পর ধারে জিনিসও নিয়ে যায় বেশ।

বীরুকে দেখেই গর্জন শুরু হয়ে গেল নাখুর, এই যে, এসে গেছেন। বল কি চাই? ... আটা? ... তোর বাপ কি এখানে আটার কল খুলে রেখেছে নাকি রে? যখন খুশি চলে এলেই হল! আমি যেন এখানে দানছত্তর খুলে রেখেছি! ভাগ ভাগ, আটা-ফাটা নেই। ... এদের লজ্জাও নেই এতটুকু ... যা, বেরো এখান থেকে, লোকে ধার নেয়, পাঁচ দিনে, দশ দিনে খুব জোর মাসখানেক পরেও পয়সা দেয় কিন্তু এদের তো বছর ঘুরে গেলেও দেখা পাওয়া যায় না ... ছোটলোকের একশেষ! যা যা বাড়ি গিয়ে বলে দে, দিচ্ছে না। চলে যা।

নাখুর এমন দাপাদাপি দেখে বীরু ভুলে যায় সে আটা নিতে এসেছে। সে হাসতে হাসতে ছড়া কাটতে শুরু করে চেঁচিয়ে — এয়রা গেয়্‌রা নাখু খেয়রা!

হুঁকো ফেলে তেড়ে আসে নাখু। বীরু চিৎকার করে পালিয়ে আসে বাড়ির দিকে। গলির মোড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। ... আটা না নিয়ে বাড়ি ফিরলে তো ... আটা নেওয়ার কাপড়টাকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ির মতো করে ফেলেছে! নাখুর দোকান এখান থেকে অনেকটা পথ। কিন্তু বাড়ি যেতে পা সরছে না। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন মনে মনে ঠিক করেই ফেলেছে, আটা যদি না পায় তো বাড়িই ফিরবে না।

একটা ছেলে ওকে প্রশ্ন করে — এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন রে বীরু?

— এমনিই।

— আয় না, খেলব।

— আমাদের বাড়িতে আটা নেই।

— সত্যি?

— সত্যি,

— তুইও কি আটা আনতে যাচ্ছিস?
— কোথায়? ছেলেটার চোখ ঝিলিক দিয়ে ওঠে।
— নাখুর দোকান থেকে। বীরুর বেশ মজা লাগছে।
— আমাদের ঝগড়া হয়ে গেছে ওর সঙ্গে।
— কেন?
— আমি কি জানি? চল খেলি গে।
— না, আমি বাড়ি যাচ্ছি।
— এখন বাড়ি গিয়ে কি করবি? চল না, খেলব।
— না।
— আরে চল না বাবা।
ছেলেটা এবার বীরুর হাতের কাপড়টার একটা কোণ ধরে টানে।
— ছিঁড়ে যাবে যে, এই হারামি, কি করছিস কি?
— তাহলে খেলতে আয়।
— আগে ওটা ছেড়ে দে।
— নে হল? এবার তো আসবি?
— আমি যে আটা নিতে এসেছিলাম।
— কোথা থেকে?
— নাখুর দোকান থেকে
— তা কি হল কি?
— ও দিল না।
— কেন দিল না?
— পয়সা ছিল না।
— যাক গে, চল খেলতে যাই।
— না।
— তবে এখানে কেন দাঁড়িয়ে আছিস, বাড়ি যা।
— বাড়ি গিয়ে কি করব?
— তাহলে আয় না, খেলব।
— না।
এই সময় আর একটা ছেলে এসে দাঁড়ায় ওদের কাছে।
— এই শালারা, এখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস?
— আমি বলছি, চল খেলতে যাই, তা ও বলছে, যাবে না।
— আমাদের বাড়িতে আটা নেই।
অন্য ছেলেটা হেসে ওঠে।
— এতে হাসির কি আছে রে হারামি ?

— গালাগাল দিচ্ছিস কেন বে?

— তুই যে আমার কথা শুনে হাসলি।

— আরে ভাই, ঝগড়া করিস কেন? খেলতে চল না — প্রথম ছেলেটা বোধ হয়, খেলতেই হবে এই রকম একটা প্রতিজ্ঞা করে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে।

— কি খেলা হবে, তোর মায়ের ...

বীরু আর দ্বিতীয় ছেলেটা এবার একসঙ্গে হাসতে শুরু করে। প্রথম ছেলেটা একটু বোকা বনে যায়।

— বীরু চল আমার সঙ্গে, আমাদের বাড়ি থেকে আটা দেব।

— আমাকেও দিবি তো? প্রথম ছেলেটা শুধোয়।

— যা, যা, শালা, তোর কাছে তো কাপড়ও নেই।

প্রথম ছেলেটা চুপ করে যায়। কথাটার যুক্তি মেনে নেয় সে।

দুজনে দ্বিতীয় ছেলেটার বাড়ির দিকে পথ ধরে। বাড়ি পৌঁছে এদের দুজনকে বাইরে দাঁড় করিয়ে সে পা টিপে টিপে চলে যায় অন্দরে। বীরু আর প্রথম ছেলেটা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে মুচকি হাসে। একটু পরেই দৌড়ে বেরিয়ে আসে ছেলেটা। হাতে একটা ছোট মতো পোঁটলা। পোঁটলাটা বীরুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে ভয়ে ভয়ে চাপা-গলায় বলে — নে শালা বীরু, এবার চুপচাপ কেটে পড়, নয় তো ...

বীরু পোঁটলাটা ভাল করে ধরতে না ধরতেই একটা কর্কশ গলা শোনা যায়, —দাঁড়া, দেখাচ্ছি মজা। কি আছে ওতে?

বীরু পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু ছেলেটার মা একলাফে এগিয়ে এসে ওর ঘাড় খামচে ধরে। পোঁটলাটা খসে পড়ে ওর হাত থেকে। পিঠে এক চড় কষিয়ে মহিলা সেইখানেই বসে পড়ে আটাগুলো জড়ো করতে করতে চেঁচাতে থাকে — চোর, কমিনা! বাড়ি লূঠ করছে!

বীরু আর অন্য ছেলেটা অন্ধের মতো ছুটতে ছুটতে নিজেদের বাড়ির দরজায় এসে থামে। হাঁফ ধরে গেছে! একটু পরে নিঃশ্বাসটা স্বাভাবিক হয়ে আসতেই বীরু পিঠের যন্ত্রণাটা অনুভব করতে পারে। ওর চোখে জল এসে যায় — হয়তো পিঠের যন্ত্রণায়, অথবা লজ্জায় আর নয়ত এতখানি ছুটে আসার জন্যে।

— এবার তো যাবি খেলতে? প্রথম ছেলেটা আবার জানতে চায়।

বীরু এমন ভাবে ছেলেটার দিকে তাকায় যেন দুটো চোখ দিয়ে তাকে গালি দিচ্ছে।

পাঁচ

ধোঁয়ায় ভরা ঘুটঘুটে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে জড়িয়ে রয়েছে এক গভীর বিষণ্ন স্তব্ধতা। দাদীর নিঃশ্বাসের ঘড়ঘড়ানি মাঝে মাঝে সেই স্তব্ধতাকে ভাঙছে বটে, কিন্তু সেটা যেন আরও ভয়াবহ মনে হচ্ছে। উনুনে কয়েকটা কাঠ জ্বলছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া অন্ধকারের মধ্যে জালের মতো ছড়িয়ে পড়ছে, তার ফলে সকলেরই দম আটকে আসছে, জ্বালা ধরছে চোখে।

ধোঁয়াগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে চতুর্দিকে। বাইরে বেরোবার পথ না পেয়ে ঢুকে পড়ছে গলার মধ্যে, চোখে যেন লঙ্কার গুঁড়ো ছিটোচ্ছে, তারপর প্রচণ্ড বিরক্ত হয়ে অন্ধকারে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

একটু পরে পরে যখনই দাদীর কাশির দমক উঠছে, মনে হচ্ছে অন্ধকারের বুকের ওপর যেন কেউ এক-একটা অদৃশ্য পেরেক ঠুকে দিচ্ছে।

অন্ধকারের মধ্যে রঘুপত চাচার জ্বলন্ত সিগারেটটা ঠিক একটা লাল চুনির মতো জ্বলজ্বলে। সিগারেটে টান দিলেই সাপের মতো হিসহিসে একটা শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে লাল চুনির ঝলসানি। সেই আলোতে অদ্ভুত দেখাচ্ছে চাচার শীর্ণ রক্তিম মুখের ঘামের ফোঁটাগুলো। ছোট ছোট উজ্জ্বল চোখ দুটো একদৃষ্টে এমন চেয়ে আছে যেন এই অন্ধকারেও চাচা কোনও একটা বিশেষ জিনিস খুব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

দেউড়ির এক কোণে চুপচাপ বসে আছে বীরু। ওর নজর লাল চুনিটার দিকে। অন্ধকারে ওটা ঠিক যেন একটা জোনাকির মতো দপদপ করছে। মাঝে মাঝে চাচা সিগারেটের ছাই ঝাড়ছে আঙুলের টুসকি দিয়ে, আর ওদিকে উনুনের কাঠগুলো চড়বড় করে ওই টুসকির জবাব দিচ্ছে। ও এবার হেসে ফেলে।

হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যেই কেউ যেন উঠে এদিকে যায়, ওদিকে যায়, একবার আসে দেউড়িতে, আবার যায় রান্নাঘরে। অন্ধকারের মধ্যেও মা যেন একটু শান্তিতে বসতে পারে না। কি যে খোঁজে কে জানে! বোধ হয় শান্তি।

ও আরও একটু গুটিয়ে-সুটিয়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে। বন্ধ করে ফেলে চোখ দুটো। কিন্তু চোখ বন্ধ করতেই জেগে ওঠে ওর সারাটা দেহ। মা যেমন চারদিকে ঘুরঘুর করছে তেমনই অদ্ভুত অদ্ভুত আরও কতগুলো জীবও যেন ঘোরাঘুরি করছে। ও দাঁতে দাঁত চেপে থাকে। আবার যেই চোখ খোলে সব কিছু অদৃশ্য। অথচ এক মুহূর্ত আগেই ওর বন্ধ চোখের ওপর নেচে বেড়াচ্ছিল ভয়ানক সব মূর্তি — ল্যাজওয়ালা তারার মতো কি যেন — কুকুর, বেড়াল কত কি!

লাল চুনিটা এখনও জ্বলছে।

একটা হাত অন্ধের মতো এগিয়ে আসে ওর দিকে। ও ভেঙে টুকরো হয়ে কিংবা একেবারে গলে গিয়ে পড়ে যায় দেবীর কোলের মধ্যে। দেবীর নরম তুলতুলে গরম কোলের মধ্যে একটু পরেই ওর কাঁপুনি বন্ধ হয়। কোলের মধ্যে ভাল করে আশ্রয় নেওয়ার জন্যে ও নিজের শরীরটা আরও গুটিসুটি করে, কিন্তু তাহলেও ও অনেকটাই লম্বা। ওর পা দু'খানা কিছুতেই আঁটে না দেবীর কোলে। দেবী ঝুঁকে পড়ে ওকে চুমো খায়, চোখ দুটি এবার ভারি হয়ে আসে। কিন্তু পেটে যে কিছু নেই। ঝিমুনি কেটে গেলে পেটের মধ্যে গুড়গুড় করতে শুরু করে, যেন ক্ষুধার্ত শিশু দুধ চাইছে।

ও অনেকক্ষণ ধরে পেটের সেই গুড়গুড়ুনি থামিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, ঠিক, যেমন করে বয়স্ক কেউ একটা শিশুকে ভুলিয়ে রাখে।

এত ছোট্ট পেট। একখানা মাত্রা রুটি পেলেই ঠেসে ভরে যেত।

রুটি ... রুটি ... রুটি ...

একটা অদৃশ্য পেরেক ক্রমাগত বিঁধছে অন্ধকারের মধ্যে।

রুটি ... রুটি ... রুটি... ও আস্তে আস্তে ঘা দিয়ে চলেছে পেরেকটার ওপর, ক্রমশ বুঝি আঘাতগুলোর জোর বাড়ছে। অন্ধকার যেন ঝিলমিলিয়ে উঠল। আর তাই দেখে ধোঁয়াও ফের হাজির।

ও চোখ বন্ধ করে ফেলে, কিন্তু ধোঁয়ার জ্বালায় আবার খুলে যায়। ও হাত মুঠো করে চোখ রগড়াতে শুরু করে। হাত ভিজে উঠছে কিন্তু চোখের জ্বলুনি কমছে না। ধোঁয়ার গর্ভ থেকে উঠে আসা এই জল যেন তরল আগুন, এ দিয়ে চোখও ধোয়া যায় না, মনের কষ্টও দূর হয় না।

ও নিঃশব্দে কাঁদতে থাকে। কাঁদতে কাঁদতে খেয়াল হয় বাবার কথা। বাবা নিশ্চয়ই গেছে আটা আনতে, একটু পরেই আসবে। দেবী ঠিক গিয়ে রুটি বানাবে, সবাই খাবে। কিন্তু এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে কোথা থেকে আনবে আটা? অন্ধকারে তো চোরেরা ঘুরে বেড়ায়। বাবাও কোথাও চুরি করতে যায়নি তো? বাবা চোর ... হঠাৎ এই অদ্ভুত কথাটা মনে হওয়ায় কেমন যেন থমকে যায় ও। চোখের জলও প্রায় বন্ধ, কিন্তু ভয় করছে খুব। অন্ধকারটা যেন অনেক রকম ভয়ানক মূর্তিতে দেখা দিচ্ছে। ও চোখ বন্ধ করে ফেলে, কিন্তু সেই ভীষণ মূর্তিগুলো তবুও ওর

মাথার মধ্যে আজব রকমের সব চিন্তা হয়ে পাক খেয়েই চলেছে। কখনও ও ভাবছে মা এসে যদি দাদীর গলা টিপে দেয় ... বা রঘুপত চাচার সিগারেটটা যদি দাদীর বিছানায় গিয়ে পড়ে ... বাবা এসে যদি মাকে মারধোর শুরু করে ... কিংবা দেবী যদি ওকে বাইরে ছুড়ে ফেলে দেয় ... অন্ধকারে সব কিছুই ঘটতে পারে।

সরু গলায় তীক্ষ্ণ এক চিৎকার বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে। দেবী দু'হাতে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খায়। চিৎকারটা এবার ফোঁপানিতে বদলে যায়। সবাই নিজের নিজের জায়গায় নড়েচড়ে বসে। অন্ধকার যেন পাশ ফিরছে, স্তব্ধতা ভাঙল এবার। কিছু শব্দ শোনা গেল, যেন কালো অন্ধকারে সাদা সাদা কয়েকটা থাম দেখা যাচ্ছে।

— তুই এখনও ঘুমোসনি?

— ঘুমিয়ে পড়, আমার লক্ষ্মী ভাইটি।

— আয়, আমার কাছে সরে আয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ভয় পেয়েছে বেচারা!

এ সব কথা শুনতে শুনতে চুপ করে যায় ও।

— লোকজনের বাস, এমন গেরস্ত বাড়ি, সেখানে একটা আলো পর্যন্ত জ্বলে না। ছি ছি।

দাদীর এই কথায় বার্তালাপ আবার অন্ধকারের দিকে ঘুরে গেল।

— বিনা তেলে আলো জ্বলবে কি করে শুনি? আমি তেল আনব কোথা থেকে?

— অলক্ষ্মীর বাসা যে সংসারে সেখানে ঘড়ার জলও শুকিয়ে যায়!

— খবরদার বলছি, অলক্ষ্মী বলবে না আমায়।

— আমার বলা-না বলায় কি আসে যায়? দুনিয়াসুদ্ধ লোক জানে।

— কি জানে? তোর মুণ্ডু?

— মা!

— তুই চুপ কর!

— রাম রাম!

— মা চুপ কর, কেন কথা বলছ? আর একটা দিন কোনও মতে কাটিয়ে দাও। কাল রাতেই চলে যাব আমরা।

চাচা রঘুপত কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিল, আবার বসে পড়ে।

— কাল যে মঙ্গলবার, বাবা।

— কাল না হোক, পরশু।

— আমাকে কি শোনাচ্ছ? আমি তো বলব, কাল কেন, আজই যাও। এ তো আমি আগেই জানতাম। আমি যতই করি না কেন, কেউ নামও করবে না। অকৃতজ্ঞ সব! ওখানে গিয়ে যেন সব সাধ মিটবে।

— বেশি কথা বাড়াবার তো কোনও দরকার নেই ভাবী।

— এ বাড়ি আমার, কেউ তো এখানে আমার জিভ চেপে ধরে চুপ করাতে পারবে না!

নিজের জিভের ওপর মায়ের খুব ভরসা। যদি এই জ্বলন্ত সিগারেটটা দিয়ে চাচা মায়ের জিভে ছ্যাঁকা দিয়ে দেয় তো খুব মজা হবে। মা যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবে! কিন্তু একটার পর একটা সিগারেট ফুঁকেই চলেছে চাচা—যেন সিগারেটগুলোই রুটি!

দেবীর কোল থেকে উঠে ও চাচার কাছে যেতে চায়। কিন্তু দেবী ওকে টেনে কাছে বসিয়ে রাখে। আবার ও উঠতে চেষ্টা করে। দেবী আবার টেনে ধরে। খেলাটা কিন্তু বেশিক্ষণ চলল না, ও বোধ হয় চাচার কাছে যাওয়ার কথাটা ভুলেই গেল। আর কিছুই যখন করা যাচ্ছে না তখন তেষ্টা পেয়ে যায় ওর।

— জল খাব।

— খালি পেটে জল? মরতে চাস নাকি? মা বলে ওঠে।

মায়ের কথা যদি শুনতে হয় তবে তো কখনই জল খাওয়া চলবে না। খালি পেটে জল খেলে মরতে হবে, খাবার পর জল খেলে কাশি হবে, খাওয়ার মাঝখানে জল খেলে পেট খারাপ হয়, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জল খেলে জল পায়ে নেমে যায়, খেলাধুলোর পর জল খেলে সর্দি-গর্মি হয়, আর গাজর বা মূলো খেয়ে জল খেলে কলেরা হতে বাধ্য ...।

— জল খাব।

— একেবারে মরতে পারিস না? সবাই মিলে আমাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাচ্ছে!

— রাম রাম।

মায়ের কথাবার্তা যখন খুব খারাপ লাগে তখনই দাদী ওই দুটো শব্দ ব্যবহার করে। মা-ও শুনলেই খুব বিরক্ত হয়।

— হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি তো তাই চাও যে এটা মরে যাক।

— রাম রাম।

ও মরে গেলে দাদীর কি লাভ? জলের জন্যে ও বায়না করতেই থাকে। ওর বোধ হয় বিশ্বাস, জল খেয়ে নিলেই খিদে মিটবে। তাছাড়া ও এই রকম বায়না করতে থাকলে সকলের মনোযোগ হয়তো আর অন্যদিকে যাবে না, এটুকু বোধ হয় ও বুঝেছে।

— দেবী, যা তো ওকে জল এনে দে, আমি দেশলাই জ্বালছি।

চাচা রঘুপতি দেশলাই জ্বালতেই ও খুশি হয়ে ওঠে। চাচা যদি এই রকম ফোঁস করে আওয়াজ করে দেশলাই জ্বালতে থাকে তাহলে ওর আর খিদে তেষ্টার কথা মনেই থাকবে না। কিন্তু দেশলাইয়ের আলোতে ওর চোখে পড়ল মা এক কোণে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষছে। ঘর্ষণের শব্দটাও শোনা যাচ্ছে। অন্ধকার যেন কোনও

একটা জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। মায়ের দু'পাটি দাঁত সেঁটে আছে একসঙ্গে। দেশলাই জ্বলার মজাটাই মাটি হয়ে গেল। আবার খুব তেষ্টা পেয়ে যাচ্ছে।

— এই নে।

ও হাত বাড়ায় কিন্তু মা এক ঝাপটায় ছিনিয়ে নেয় গেলাসটা। জল ছিটকে পড়ে, আবার শোনা যায় দাদী রাম রাম বলছে।

— ফের জল চাইবি? মা ওর হাত মুচড়ে দিচ্ছে।

—জল, জল, জল, — গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে শুরু করে ও। যেন বিদ্রোহ করছে অন্ধকারের বিরুদ্ধে। ধোঁয়ার স্তর ঠেলে সরিয়ে ভেংচি কাটছে নিস্তব্ধতাকে। মা হাত ছেড়ে দিতেই ও চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটোছুটি আরম্ভ করে দিল। মা এবার ওর পিছনে ছোটে আর ও হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়।

— মাথাটা ফাটিয়েছ তো? কোথায় লাগল দেখি?

মা এবার ওকে চেপে ধরে বুকের মধ্যে। মা যে কি চায় ও কিছুই বুঝতে পারে না। ওর হাত চেপে ধরে আছে, পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মুখে-কপালে চুমো খাচ্ছে কেন? এই কি সেই মা যে এখনই হাত মুচড়ে দিয়েছিল? যে দাদীর সঙ্গে ঝগড়া করে, বাবার হাতে মার খায়, দেবীকে গালাগাল দেয়, যাকে ওর একটুও ভাল লাগে না? যদি এখন এই অন্ধকার না-ও থাকত তাহলেও বোধ হয় মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারত না এই মা, সেই মা কি না।

তেষ্টা ওর মিটে গেছে। সবাই এপাশ ওপাশ করে নড়েচড়ে আবার বসে পড়েছে। অন্ধকার আবার ছেয়ে গেছে। ধোঁয়াও এসে হাজির। নিস্তব্ধতা আবার ওই দুটোকে যেন কষে চেপে ধরেছে।

অনেকক্ষণ পরে, কে জানে কতক্ষণ হবে, খটাস করে খুলে গেল দেউড়ির দরজা। হাওয়ার কাপটার সঙ্গে একটা দুর্গন্ধ ভেসে আসে। অন্ধকার যেন নাক চেপে ধরে, ধোঁয়াও বুঝি পিছু হঠে, নিস্তব্ধতা সরব হয়।

বাবা টলছে দরজায় দাঁড়িয়ে। হোঁচট খেয়ে পড়ে আবার উঠে দাঁড়ায়। টলমল করতে করতে ভেতরে আসে। অন্ধকারে জ্বলে ওঠে আরেকটা লাল চুনি। বাবার পাগড়িটা একটা বাঁকাচোরা রেখার মতো দেখাচ্ছে। রেখাটা মাটিতে বিছিয়ে পড়ে আছে সাপের মতো।

— রুটি নিয়ে আয়!

কি কর্কশ স্বর, ঠিক যেন মা চারপাই ধরে টানছে।

— রুটি নিয়ে আয় মাগি, কথা কি কানে যাচ্ছে না?

বাবার গলার স্বর বেশ জড়ানো।

অন্ধকারটা ক্রমে আরও দুর্গন্ধময় হয়ে উঠছে।

— সেই থেকে বলছি, রুটি নিয়ে আয়।

— একটু হুঁশ কর ভাই। চাচা উঠে বাবাকে ধরে অন্দরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এই সময় হঠাৎ মায়ের কান্নার শব্দে অন্ধকার যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।

বাবা এবার হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে গিয়ে মায়ের ঘাড় খামচে ধরে।

মা চিৎকার করে ওঠে, — মেরে ফেললে রে!

— এটা কি বাড়ি না পাগলা গারদ, বিড়বিড় করে চাচা রঘুপত ।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মা ছুটে চলে যায় রাস্তায়। সেইখানে বসে চিৎকার করে বিলাপ শুরু করে। বাবা এখন একেবারে শান্ত, নেশা ছেড়ে গেছে মনে হয়।

— ভেতরে চলে এসো ভাবী।

— মা, ভেতরে এসো না!

— লোকে কি বলবে, মা!

— সেটুকু বুদ্ধি যদি ওর থাকত তাহলে কি আজ সংসারের এই দশা হয়?

কিন্তু এসব কথার কোনও প্রভাবই পড়ে না মায়ের ওপর। চেরা গলায় মা গোটা পাড়াকে জানিয়ে দিচ্ছে বাবার কথা। বাইরে গিয়ে চাচা মাকে অনুরোধ করতে থাকে ভেতরে আসার জন্যে। কিন্তু মায়ের যেন মাথায় ভূত চেপেছে। ওইখানে বসে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কেবল চেঁচাচ্ছে, — হায়, হায়।

— বাড়ি নয়ত যেন পাগলা-গারদ, গজগজ করতে করতে ভিতরে চলে আসে চাচা।

— মা, এভাবে লোক জড়ো করছ কেন?

— নির্লজ্জ কোথাকার! অলক্ষ্মী।

কারও কথাই যেন কানে যাচ্ছে না মা'র। কোনও জবাব না দিয়ে একটানা সুরে চেঁচিয়েই চলেছে কেবল।

বাবা চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

সামনের বাড়ির দরজা খুলে যায়। একজন স্ত্রীলোক লণ্ঠন হাতে এসে দাঁড়াল দরজায়। আরও কয়েকটা দরজা খুলে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই লণ্ঠনওয়ালির চারপাশে আরও অনেক মেয়ে এসে জড়ো হয়। তাদের দেখে আরও বেড়ে যায় মায়ের চিৎকার। ভিড়ের মধ্যেও চাপা গলায় আরম্ভ হয়ে যায় আলোচনা।

বীরু একদৃষ্টে চেয়ে থাকে মেয়ে-বৌগুলোর দিকে।

— ভাবী ভেতরে চলে এসো বলছি! চাচা রেগে গেছে, মায়ের হাত ধরে ভেতরে টেনে আনতে চেষ্টা করছে।

— ছেড়ে দাও আমাকে! খবরদার বলছি, গায়ে হাত দেবে না ! ছেড়ে দাও বলছি!

কিন্তু চাচা তবুও কোনও মতে মাকে টেনে আনে দরজার মুখের চাতালটা পর্যন্ত। বাবা এগিয়ে এসে টেনে নেয় বাড়ির মধ্যে। দেউড়ির দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাবা অন্ধকারে গর্জন করে ওঠে। এখন তার জড়ানো গলা নয়, নেশা ছুটে গেছে, বদলে শুধু জ্বলন্ত ক্রোধ। নেশার চেয়ে বাবার রাগের তেজ অনেক বেশি। বীরু ভয়ে সিঁটিয়ে যায়। অন্ধকারের মধ্যেই ভীষণ হুটোপাটি শুরু হল।

— এটা কি, বাড়ি না পাগলা গারদ!

চাচার কথায় বাবার রাগ একটুও কমে না।

দেবী একবার দেউড়ির দরজা খুলে ছুটে যায় বাইরে। ফিরে আসে একটা লণ্ঠন হাতে নিয়ে। দরজা আবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।

লণ্ঠনের অলোয় অন্ধকার একটু ফিকে হয়েছে। সেই ফ্যাকাশে অন্ধকারে দেখা যায় মায়ের উসকো খুসকো চুলগুলো শুকনো ঘাসের মতো উঁচু হয়ে উঠে রয়েছে, চোখ দুটো লাল, তাতে জল আর আগুন দুইই ঝরছে, মোটা মোটা রুক্ষ দুই হাতে মা কখনও কপাল, কখনও বা বুক চাপড়াচ্ছে, সেই সঙ্গে পূর্ণ বিক্রমে মুখও চলছে বিরামহীন। জিভ দিয়ে যেন বিষ ঝরছে মায়ের। আর সেই সঙ্গে বেদনাও ...।

ও চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। সে-চাউনিতে একই সঙ্গে ঘৃণা আর ভালবাসা! বাবার দিকে তাকায় ও। ঝুঁকে পড়া দেহ, যেন কত বুড়িয়ে গেছে, আবার যৌবনের ছিটেফোঁটা তলানিটুকুও পড়ে আছে। কপালটা বেশ চওড়া, কিন্তু মোটা মোটা বলি-রেখায় অনেকটাই ঢাকা, বড় বড় দুই চোখে এখন নেশার সঙ্গে কেমন একটা কুণ্ঠিত কোমলতার আভাস, জ্বলজ্বলে মুখে লেগে থাকা লাল্‌চে আভাটা বাবার রাগের। সেই সঙ্গে একটা কেমন ফ্যাকাশে ভাব, যেন কিছুটা ভয়ও পেয়েছে!

ও একবার দেখছে মাকে, একবার বাবাকে। যেন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করছে দুজনকে। মাঝে মাঝে দেউড়ির বন্ধ দরজার দিকেও নজর চলে যাচ্ছে। দরজাটা খোলা থাকলে হয়তো ও ছুটে বাইরে পালিয়ে যেত। ওর ভেতরের যা কিছু সব যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। চোখ দুটো হঠাৎ এত জ্বালা করছে, কেউ যেন দুটো কাঁটা গরম করে তাই দিয়ে ওর চোখে বিষাক্ত কাজল লেপে দিয়েছে। ঘাড়টা দুলতে শুরু করেছে ওর, দম দেওয়া জাপানি পুতুলের মতো।

— এটা বাড়ি না পাগলা গারদ, অ্যাঁ!

বীরুর মনে হল ওর কথাগুলোই চাচা রঘুপত মুখ দিয়ে বার করে দিল।

গ্রামে ফিরে যাওয়ার আগে দাদী খুব আদর করে ওকে। আশীর্বাদ করে। চুমো খেয়ে খেয়ে ভিজিয়ে দেয় ওর মুখ-মাথা। তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করে। দাদীকে কাঁদতে দেখে ওরও কান্না পায়। দাদী গাঁয়ের নাম বলে দেয়, ওকে বলে চিঠি লিখতে। কিন্তু গাঁয়ের নামটা ও উচ্চারণ করার আগেই মা এসে দাদীর কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় ওকে। দাদী আর চাচা বাবার সঙ্গে রওনা হয়ে যায় স্টেশনের উদ্দেশ্যে।

দাদীর গাড়ির শব্দ শুনতে ইচ্ছে করছিল বীরুর, কিন্তু মা বাড়ির মধ্যে বেজায় হৈ-চৈ লাগিয়েছে। দাদী চলে গিয়ে দেউড়িটা একেবারে খালি, ভাঙাচোরা দেওয়ালগুলো কেমন যেন অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মা ধূপ জ্বালিয়ে দেয় দেউড়িতে। বলে, এখন দশদিন ধরে রোজ ধূপ জ্বালাবে তবে যদি দুর্গন্ধ দূর হয়। মায়ের কথাবার্তাই আজব রকম। মা যদি ভাল হত, দাদী ওদের ছেড়ে চাচা রঘুপতের সঙ্গে কখনও

চলে যেত না। দাদীর ঝুলে পড়া চারপাইটার ওপর শুয়ে পড়ে পারিবারিক সমস্যাগুলোকে নিজের মতো করে ভেবে দেখছিল বীরু।

দেবী এসে বসে ওর কাছে। ঠাম্মার গাঁয়ের গল্প শোনায়। শুনতে শুনতে ও ভুলেই যায় কেন ওকে এসব গল্প শোনানো হচ্ছে। ওর কান্না থামে। কিন্তু আবার এক-একটা কথা শুনে শিশুমনে কোথায় যে ঘা লাগে। আবার ডুকরে ওঠে ও। দেবী ভেবে পায় না কি করে চুপ করাবে ভাইকে।

— দাদী চাচীর বাড়ি গেল।

— কেন গেল?

— তুই কি চাচীকে দেখেছিস বীরু?

ও কোনও উত্তর দেয় না।

— চাচী খুব ভাল। চাচীর কত লম্বা চুল জানিস তুই!

চুল লম্বা তো কি হয়েছে? এই দেবীটা কে জানে আরও কত দিন আমাকে কচি খোকা ভাববে।

—চাচীর জানিস তো দুটো বাচ্চা — একটা ছেলে একটা মেয়ে। ওদের নাম তো জানিস না? বলব? শুনবি নাকি?

ও 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলে না। মাথাও নাড়ে না। ইচ্ছে হয় তো বলুক! এখন আমি বলে দাদীর কথা ভাবছি, আর তার মধ্যে দেবী যে কেন এখন এই সব বকর বকর শুরু করেছে।

— ছেলের নাম রাম আব মেয়ের নাম শল্লী। দুজনেই তোর চেয়ে ছোট।

— দুজনেই আমার চেয়ে ছোট কি করে হবে?

— চাচী খুব ভালবাসে ওদের।

ভালবাসা কথাটায় কি যে আছে, ওর চোখ আবার ভিজে ওঠে। দেবী এখন চুপ করে থাকুক। ও একলা একলা বসে কাঁদতে চায় এখন। চাচীর কথাও ভাবতে চায়, যে চাচী তার বাচ্চাদের খুব ভালবাসে।

— রাম উঁচু ক্লাসে পড়ে, শল্লী বাচ্চাদের ক্লাসে। দুজনে একসঙ্গেই স্কুলে যায়। গাঁয়ে একটা ছোট স্কুল আছে। একদিন আমিও ওদের সঙ্গে গিয়েছিলাম, কিন্তু ভেতরে যাইনি।

ও কিছু জিজ্ঞেস করতে গিয়েও কি ভেবে চুপ করে যায়।

— দেখ বীরু, আমার সঙ্গে যদি কথা না বলিস তো আমি আবার চাচীর কাছে চলে যাব।

— যাও না, চলে যাও! রাগ করে বলে ও।

দেবী এবার ওকে জড়িয়ে ধরে দু'হাতে। প্রথমটা ও ছটফট করে ওঠে, কিন্তু ক্রমশ ওর শরীরে যেন কি রকম একটা অজানা স্নিগ্ধ অনুভূতি নেমে আসে। নিজেকে শিথিল করে ছেড়ে দেয় দেবীর কোলের মধ্যে। কিছুক্ষণের জন্যে দাদীর

কথাও সরে যায় ওর মন থেকে। ভুলে যায় আর একটু পরেই দাদীর ট্রেনের শব্দ শুনতে পাওয়া যাবে।

— চাচার বাড়িতে জানিস একটা বেড়াল আছে, তার রংটা একেবারে কালো। রাতের বেলা দেখলে ভয় করে। রাম ওটার ল্যাজ ধরে টানলেই ও ডেকে ওঠে, মিয়াঁও! শল্লী খুব ভয় পায় ওকে দেখে।

মিয়াঁও, মিয়াঁও শুনে ওকে হাসতেই হল। দেবী এখানে আসার পর আজ এই প্রথম কেউ এভাবে বসে তার সঙ্গে এমন মিষ্টি করে কথা বলছে। রোজ যদি কিছুক্ষণও এমন করে দেবী ওর সঙ্গে কথা বলে তাহলে ও আর ভুলেও দাদীর কথা ভাববে না। যখন ও দাদীর কোলে বসে থাকত তখন দাদীর ঝুলে পড়া মাংসের তলাকার ঠেলে ওঠা হাড়গুলো মাঝে মাঝে ওর গায়ে ফুটত। দেবীর কোলটা একেবারে নরম তুলতুলে।

— ওদের উঠোনে একটা কুলগাছ আছে। কি মিষ্টি কুল যে হয়, তুই খাবি? চাচীকে লিখে দেব, খামে ভরে পাঠিয়ে দেবে তোর জন্যে।

খামে ভরে আবার কুল পাঠায় নাকি কেউ? দেবীটা আমাকে একেবারেই বুদ্ধু মনে করে। ও বোধ হয় ভাবে, আমি এখনও সেই ছোট্ট খোকাটি, যাকে কোলে নিয়ে ও সারাদিন ঘুরত। ও সরে এল দেবীর কোলের ভেতর থেকে।

— ওদের গ্রামে সব কাঁচামাটির বাড়ি, শুধু চাচাদের বাড়িটাই পাকা। ওদের বাড়িতে সব সময় বস্তা ভরা আটা থাকে। ঝগড়া ঝাঁটি একেবারে নেই। চাচীর সব সময় হাসি মুখ। বাচ্চাদেরও কান্নাকাটি নেই। কেউ জোরে কথা পর্যন্ত বলে না।

ওকে ভোলাতে ভোলাতে দেবী বোধ হয় নিজেকেও ভোলাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে চাচার বাড়ির এইসব খুঁটিনাটি গল্প বীরুকে শোনাতে থাকে দেবী। বীরুও খুব মন দিয়ে শোনে।

এসব কথা এত ভাল করে বোধ হয় এই প্রথম শুনছে ও। মনে মনে চাচার বাড়ির সঙ্গে নিজেদের বাড়ির তুলনা করছে। দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা রেখা টেনে দিচ্ছে যেন।

— চাচার বাড়িতে আর কি কি হয়?

— হয় তোমাদের দুজনের মুণ্ডু!

এর মধ্যে কোথা থেকে মা এসে হাজির, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে।

— চাচার বাড়ি এই আছে, চাচার বাড়ি ওই আছে! এতই যদি সুখে ছিলি তো সেখানেই থেকে গেলি না কেন শুনি? কে বলেছিল ফিরে আসতে? খবরদার বলে দিচ্ছি, আমার বাড়িতে ওদের নাম উচ্চারণ করবে না! এসে যখন জুটেছ, চুপচাপ থাকতে হবে। ভারি আমাকে চাচার বাড়ি দেখাতে এসেছেন!

মায়ের সামনে কারও প্রশংসা করলেই ঝগড়া বেধে যাবে। কেউ অন্যের প্রশংসা করলেই মা বেশ বুঝতে পারে তার আড়ালে ওর প্রতি একটা উপেক্ষা

লুকিয়ে রয়েছে। আর নিজের সম্বন্ধে এই ধরনের সামান্য ইঙ্গিতও মা'র পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

— আর তো ছোটটি নও, লম্বায় তো ছাদে মাথা ঠেকছে, একটু কাজকম্ম কর এবার। আমি কি তোমাদের সকলের দাসী-বাঁদী যে একলা সারাটা দিন খেটে মরব? এখন উঠবে কি না এখান থেকে?

দেবী তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে। মায়ের জিভ দিয়ে যে বিষ ঝরছে সেই বিষের ঝিলিক দেবীর চাউনিতে।

— দেখ মা, আমার সঙ্গে এখন থেকে ভাল ভাবে কথা বলতে হবে। সবাইকে একই লাঠিতে ...

— তোর লাঠির নিকুচি করেছে! তুই আমাকে কথা বলা শেখাবি? একটা পাপ বিদেয় হল তো আরেকটা এসে জুটল, অ্যাঁ! আমার কপালেই যত দুর্ভোগ!

প্রতি কথায় কপালের দোষ দেওয়া মা'র অভ্যেস। কে জানে কেন মা'র মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে সারাটা দুনিয়া তার বিরুদ্ধে। এই ভুলটা কেটে গেলে হয়তো মনে একটু শান্তি পেত বেচারা।

— তোমার যে কি হয়েছে কে জানে।

— হয়েছে তোমার মাথা! নবাবজাদী একেবারে! এই রকম যদি বোলচাল ঝাড়ো, তাহলে যেখানে যাবে সেখানেও তেমনই সুখে থাকবে!

দেবীও তাহলে কোথাও যাবে? যাক চলে। সবাই চলে যাক। সবাই মরে যাক। আমি একলা এখানে পড়ে থাকব। ওর মাথাটা যেন ঘুরছে। হঠাৎ দাদীর গাড়ির শব্দে ওর হুঁশ ফেরে। আবার জল এসে যায় চোখে। গাড়ি থেমে গেল বুঝি! ও চিৎকার করে ওঠে — দাদী!

দেবী আর মা দুজনেই এমন ভাবে ওকে দেখতে থাকে যেন ও পাগল হয়ে গেছে। গাড়ি আবার চলতে শুরু করেছে। ও এবার ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। মা এক চড় মারে ওর পিঠে। দেবী মা'র হাত চেপে ধরে। মা চটে গিয়ে গজগজ করতে শুরু করে। কিন্তু বীরু কিছুই টের পায় না। গাড়ির শব্দে এখন নিজের কান্না মিশিয়ে দিচ্ছে সে। সেই শব্দ ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। বীরুর চোখের জলও শুকিয়ে যায়। আস্তে আস্তে দাদীর ঢিলে চারপাইটাতে গিয়ে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ে ও।

ছয়

মিনিটে মিনিটে মা উঠে এসে দেউড়ির দরজা খুলছে। এদিক ওদিক দু'একবার উঁকি মেরেই আবার দরজা বন্ধ করে এসে বসছে ওর মাথার কাছে। মা দরজার কাছে গেলেই ও একটুখানি চোখ খুলে মাকে একবার দেখে নিচ্ছে। দরজা বন্ধ হলেই ও চোখ বন্ধ করে ফেলে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরেই এইভাবে শুয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মায়ের এই ছটফটানির মজা দেখছে ও। কিছুক্ষণ পরে গজগজ করতে করতে মা গেল রান্নাঘরে। বাসনপত্র এদিক ওদিক আছড়াতে শুরু করল। বাসনগুলো সব তেবড়ে গেছে। মা যখন রাগটা আর কারও ওপর ঝাড়তে পারে না তখনই বাসনগুলোর এই দুর্গতি হয়।

— ঘুমোলি নাকি?

ও চুপ করে থাকে। দেবী শুয়ে আছে ওর পাশেই।

দেবী ঘুমোতে বড় ভালবাসে। বসে বসে, কথা বলতে বলতেই হয়তো ঘুমিয়ে পড়ল। তারপর মাথার কাছে ঢোল পিটলেও তার ঘুম ভাঙবে না। মা বলে, ভাবনা চিন্তা না থাকলে তবেই নাকি অমন গাঢ় ঘুম হয়। দাদী যাওয়ার পর থেকে মা সব সময় দেবীর সঙ্গেই ঝগড়া বাধাচ্ছে। কথায় কথায় ওকে ভাল-মন্দ অকথা-কুকথা বলেই চলেছে।

মা এখানে না থাকলে ও ঠিক দেবীর পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে ওকে জাগিয়ে দিত। সুড়সুড়ির কথা মনে হতেই ওর ঠোঁটে হাসি ফুটেছে।

— ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাসছিস যে?

মা ওর পাশে বসে গালে হাত দিয়ে আদর করছে। হাতটা খরখরে, তাতে পেঁয়াজ আর কেরোসিন তেলের গন্ধ। ও নাকের বদলে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। ওর হাঁ করা মুখ বন্ধ করে দিয়ে মা মৃদুস্বরে বলে — হে ঈশ্বর, হে প্রভু, জগৎপিতা জগদীশ্বর!

অনেক দূরে কোথাও কুকুর ডাকছে। ও পাশ ফিরে মায়ের গা ঘেঁষে শোয়।

— ঘুমোসনি এখনও?

ও কোনও উত্তর দেয় না। মাকে ঠকাবার জন্যে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে মা আবার মৃদুস্বরে ভগবানের নাম করতে থাকে। ও পাশ ফিরে শোয়।

— তোর কি হয়েছে বল তো? ঘুমোচ্ছিস না কেন?

— ঘুম আসছে না যে!

— আসবে কি করে? শুকনো কাশি হয়েছে তোর, ঘরে তো একটু ঘি-ও নেই যে মালিশ করে দেব। অস্বস্তি লাগছে?

— হ্যাঁ।

মা ওর চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটছে। হঠাৎ হাত থেমে গেল।

— এখানে কি হয়েছে?

— কিছু হয়নি।

— বলছিস না কেন? কিছু বলব না, বল কি হয়েছে? পড়ে গিয়েছিলি?

— হ্যাঁ।

— কি করে? কোথায়? দিনের বেলা বলিসনি কেন? এতখানি ঢিপি হয়ে ফুলে রয়েছে মাথায়! কোথা থেকে পড়েছিলি? কেউ ধাক্কা দিয়েছিল না কি? বল্ না?

— এমনিই খেলতে খেলতে পড়ে গেছি।

— কেউ মারেনি তো? সত্যি সত্যি কি হয়েছিল বলছিস না কেন?

ও এখন কি করে বলে যে মাস্টারমশাই বেত তুলে নিয়েছিলেন, আর ও বেতের ঘা থেকে বাঁচতে নিচু হয়ে বসে পড়েছিল বলে সেই বাড়িটা পড়েছে মাথায়। মা তো শুনলেই সব কিছু ভুলে এখন মাস্টারের শ্রাদ্ধ করতে শুরু করবে।

— বল না, কেউ মারেনি তো?

— না মা, এমনিই খেলতে খেলতে ঠুকে গেছে।

— কতবার না বলেছি, একটু দেখেশুনে খেলবি। তোর যদি কিছু হয় আমি কি করব বল তো? নিজেকে একটু বাঁচিয়ে চলতে পারিস না? তোকে নিয়েই তো আমি বেঁচে আছি। তোর যদি কিছু হয়? বল না, কথা বলছিস না কেন? তুইও আমার কথা একটু ভাববি না? আর সব্বাই তো আমাকে কেবল কষ্ট দেয় ...

মা কথা বলেই চলেছে। ও কিছু বুঝছে, অনেকটাই বুঝছে না। তবু মা'র কথাগুলো শুনতে ওর ভাল লাগছে। গলার কাছটা আবেগে ব্যথিয়ে উঠছে। মা যদি সব সময় এমনি মিষ্টি করে কথা বলত, তাহলে ও মাকে এত আদর করত, এত আদর যে মা দারুণ খুশি হয়ে যেত।

— তুই বড় না হওয়া পর্যন্ত আমার জীবনটা একটা নরক, বুঝলি খোকা। ঠাকুর তোকে তাড়াতাড়ি বড় করে দিন। কেউ যেন তোর চুলের ডগাটুকুরও ক্ষতি না করতে পারে। তোর গায়ে যেন খারাপ বাতাস না লাগে, খোকা! তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল? হে ভগবান, একে তুমি ভাল রেখো!

ও মায়ের গায়ে একেবারে সেঁটে রয়েছে। মায়ের কাপড়টা ভিজে ভিজে, কিন্তু এখন ও আর কোনও দুর্গন্ধ পাচ্ছে না।

মা আর ওর মাথা চুলকে দিচ্ছে না। হাত জোড় করে, চোখ বুঁজে ছাদের দিকে মুখ তুলে বলে চলেছে, — হে ঠাকুর, আমার সারা জীবনে এই একটিই পুণ্যফল পেয়েছি। এর যেন কখনও কিছু না হয় ...।

মায়ের মাথায় এই সব চিন্তা ঢুকলেই মুশকিল। এখন সারা রাত হয়তো ওপর দিকে মুখ তুলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলতে থাকবে।

— মা, তুমি মাথা চুলকে দাও না। আমার কিছু হবে না, আমার জন্যে তোমাকে অত চিন্তা করতে হবে না।

— তোর কিছু হলে আমি বিষ খেয়ে মরব খোকা। তোর আশাতেই তো বেঁচে আছি সোনা।

মায়ের গলা কাঁপছে। আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে কথার মাঝে। মায়ের কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে ও। বললেও যখন থামবে না মা, কথা বলেই চলুক তখন।

— আমার বাবা বলতেন, জানকী, তোর আবার ভাবনা কিসের? দেখতে দেখতে ছেলে বড় হয়ে উঠবে, তখন সব দুঃখ ঘুচে যাবে। ঈশ্বর এতদিনে তোর প্রার্থনা শুনেছেন এর জন্যেই তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

মায়ের বাবা আবার কে?

— তোমার বাবা কে মা?

— তোর মনে থাকবার কথা নয় বাবা। তুই তখন কত ছোট। মোটে দু'বছরেরটি। তোকে কোলে নিলেই তাঁর চোখে জল আসত। বলতেন, আহা, এর বিয়েটা পর্যন্ত যদি বাঁচতাম!

— এখন তিনি কোথায় মা?

— পাঁচ বছর হয়ে গেল, তিনি মারা গেছেন সোনা।

ও তখন কোথায় ছিল জানতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু মা এখন কাঁদছে। ও চুপচাপ চেয়ে থাকে মায়ের দিকে। মায়ের মনটা অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে চায় —

— মা, বাবা এখনও আসছে না কেন?

— কি জানি, কেন। কি যে হয়েছে ওঁর আজকাল। মাঝরাত্তির পর্যন্ত বাড়ি ফেরার নাম নেই। তাই তো বলছি রে, তুই চটপট বড় হয়ে ওঠ। তবেই আমাদের দুঃখ ঘুচবে। তুই বেঁচে-বর্তে থাক বাবা, আমার নিজের কথা চিন্তাও করি না। আমার কপালে সুখই লেখা নেই, তো পাব কোত্থেকে! জন্মে পর্যন্ত ...

মায়ের গলা আর শোনা যায় না। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। এমন আস্তে আস্ত মা কাঁদছে দেখে বেশ অবাক লাগছে বীরুর। মা যখন কাঁদে তখন গোটা পাড়া শুনতে পায়। ওদের গলির সব লোক এসে জড়ো হয় দরজার সামনে। অথচ এখন মা এত আস্তে কাঁদছে। ওর কানে পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না কান্নার আওয়াজ।

— মা, জল এনে দেব?

— বাবা, তুই যদি কোনও দিন আমার সব কথা শুনিস, দেখবি আমি কত কষ্ট সহ্য করেছি, কত দুঃখ ভোগ করেছি।

মায়ের এই দুঃখের পাঁচালি কতক্ষণে শেষ হবে কে জানে। এর মধ্যে বাবা যদি এসে পড়ে তাহলে বোধ হয় থামবে। কিন্তু তখন আবার দুজনে ঝগড়া বেধে যাবে সে ভয়ও আছে। সেই কথা ভেবে ও বেশ ভয় পায়। তার চেয়ে এই ভাবে পাঁচালি শোনাও ঢের ভাল। এই ভাবে হয়তো ঘুমও এসে যাবে।

— আমি যখন এতটুকু তখনই তো বিয়ে হয়ে গেল। সেই তখন থেকে এই আজ পর্যন্ত একটা দিনের জন্যেও শান্তি পাইনি। সেদিনের কথা তুই জানিস না। বাবা বলতেন, সাতপাকে ঘোরানোর সময় আমার এত ঘুম পেয়ে গিয়েছিল যে সবাই মিলে ঠেলেঠুলে কোনও রকমে জাগিয়ে রেখেছিল। কতই বা বয়েস তখন। পুতুল খেলার বয়েস। কি যে হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝিনি। তখন কে যেন বলল, ওরে তোর বিয়ে হচ্ছে যে, আমি পট করে উত্তর দিয়ে বসলাম, ধ্যাৎ তোর বিয়ে হচ্ছে বোধ হয়! এর জন্যে বাবার কাছে বকুনিও খেয়েছিলাম, একটু একটু মনে আছে।

উঃ। কি যে মাথামুণ্ডু বকে যাচ্ছে মা, একটা যদি লাহোর তো অন্যটা পেশওয়ার! যা মনে আসছে বলে চলেছে। এই সব আজগুবি গল্প বাবা শোনে কি করে! আর শোনেই বা কোথায় বাবা?

— ওইটুকু বয়সে কত কি যে দেখেছি! তোর দাদী কতবার পুরো দু'দিন আমাকে কিছু খেতে দেয়নি। অন্ধকার কুঠরিতে বন্ধ করে রাখত জানিস। ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যেত। সারাটা দিন কাটত শুধু কেঁদে কেঁদে। কেউ খোঁজ খবর নিত না আমার। ইনি তো তখন সারাটা দিন বাইরে বাইরেই কাটাতেন। স্কুল থেকেই কে জানে কোথায় চলে যেতেন। ইনি যে বিগড়ে গেলেন, তার জন্যে সবচেয়ে দায়ী তোর দাদী। আমাকে তো তোর দাদী সারাটা দিন গাল দিত। বলত, তোর কি এতটুকু আক্কেল নেই? আমার তখন কি-ই বা বয়স, আক্কেলটা হবে কোথা থেকে? তবু তখনও তোর দাদীর চেয়ে আমার বুদ্ধি ঢের বেশি ছিল। আমায় আবার তিনি শেখাতে আসতেন ...

দাদী চলে যাওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেছে কিন্তু মায়ের মনের আগুন এখনও নেভেনি। কেউ ভুলেও যদি দাদীর নাম উচ্চারণ করে, তাহলেই মা এমন তিড়বিড়িয়ে জ্বলে ওঠে যেন দাদী ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নিজে নিজে দাদীর কথা তুললে মা এমন সব কথা শুরু করে, — বীরুর যেমন রাগ হয় তেমনই আশ্চর্য লাগে। দাদীর কি মাথা খারাপ ছিল যে মাকে খেতে দিত না? হয়তো খাবার নেই বলে দিত না। না থাকলে দেবে কোথা থেকে? এখনও তো কত সময় বাড়িতে আটা ফুরিয়ে যায়। তার মানে তো এই নয় যে ...

— আমার বয়সী মেয়েরা সব কেমন মজা করে ঘুরে বেড়াত আর আমি

বাসন মেজে মেজে সারা। ছুটি আর পেতাম না। শীতের দিনে আমার ছোট কচি হাত ঠাণ্ডায় জমে যেত, কিন্তু মুখ দিয়ে একটু শব্দ বের করার সাহস হত না। রোজ রাতে জ্বর আসত, হাড়গোড় একেবারে টনটন করত। একটা পুরনো ছেঁড়া কম্বল ছাড়া আর তো কিছু জুটত না গায়ে দিতে। হাঁটু দুটো বুকের কাছে গুটিয়ে সেই কম্বলের তলায় কেঁপে কেঁপে কাটাতে হত শীতের লম্বা রাত। জ্বর তো আমার এখনও লেগেই থাকে, এখনও আছে, গায়ে হাত দিয়ে দেখ একবার।

মায়ের অনেক রকম ভুল ধারণা আছে, তার মধ্যে একটা হল পৃথিবীর যত রকম অসুখ সব মাকেই চেপে ধরেছে। দিনের মধ্যে অনেকবার নিজের বাঁ হাতের কবজি ডানহাতে চেপে ধরে নাড়ি দেখে।

— কত সময় খুব ক্লান্ত হয়ে ভেবেছি এবার চারপাইতে ঝুপ করে শুয়ে পড়ব, তখনই হুকুম হত, তোর দাদীর পা টিপতে হবে। পা টিপতে টিপতে ঢুলে পড়লেই বিপদ, তাহলেই লাথি খাও।

কি যে বকর বকর করে চলেছে মা, শুয়ে পড়লেই পারে।

— মা, তোমার কি ঘুম আসছে না?

— আমার কি আর ঘুম আসে রে! ভাবনায়-চিন্তায় আমার ঘুম একেবারে গেছে। মাঝে মাঝে আমার নিজেরই অবাক লাগে, এতসব সহ্য করেছি কি করে! আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে এতদিনে মরেই যেত। আমার হাড় খুব শক্ত।

তাতে তো কোনও সন্দেহই নেই। মাঝে মাঝে মায়ের মুখ দিয়েও নিজের সম্বন্ধে এক একটা সত্যি কথা বেরিয়ে পড়ে। বাবা যে রকম ঠ্যাঙায়, হাড় শক্ত না হলে তো এতদিনে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কথা।

— তোর বাবাও তখন অনেক ছোট, স্কুলে পড়ে। স্কুল ছিল অন্য গাঁয়ে। আমি তো ওকে বড় দাদা ভাবতাম। আমার ইচ্ছে করত ওর সঙ্গে ছুটোছুটি করে খেলা করি। কিন্তু স্কুল থেকে ফিরতে রাত হয়ে যেত। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই যত খারাপ অভ্যাস শেখা হয়ে গিয়েছিল।

এ সব কথা মনে পড়তে মা বোধ হয় একটু হেসে ফেলেছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, কাঁদছে—এমনও হতে পারে। মা খুব কম হাসে। বাড়িতে থাকলে বাবাও খুব কম হাসে। কিন্তু বাড়ির বাইরে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে বাবাকে ও মাঝে মাঝে বেশ জোরগলায় হেসে উঠতে দেখেছে। বাড়িতে ঢুকলেই হাসি যে কোথায় উড়ে যায় কে জানে! সব দোষ মায়ের। দেবী প্রথম প্রথম যখন চাচার বাড়ি থেকে এসেছিল, বেশ কথায় কথায় হেসে উঠত। এখন তো সারাদিন মুখ ভার করে বসে থাকে। বেচারি যদি কখনও ভুলেও একটু হেসে ফেলে তো মা তক্ষুণি এমন খিঁচিয়ে উঠে মুখ শোনায় ... অবশ্য মা যে বাড়িতে আছে সেখানে হাসি-টাসির প্রশ্নই ওঠে না। ও নিজেও তো বাড়িতে থাকলে খুব কমই হাসে। অবশ্য স্কুলেও ও বিশেষ হাসে না। কিছু ছেলে আছে, যারা ওকে দেখলেই চেঁচাতে শুরু করে, কাঁদছিস কেন

রে? ওর মুখখানাই যে অমনি। এ রকম ঠাট্টা শুনলে ওর এত রাগ হয়। সত্যিই কাঁদতে ইচ্ছা করে তখন।

— তোর দাদীর হুকুম ছিল, তোর দাদাজির সামনে ঘোমটা না টেনে যাওয়া চলবে না। আমার এদিকে মাথায় ঘোমটা থাকতেই চাইত না। তাই নিয়েও দাদী আমাকে কম জ্বালিয়েছে! তোর বাবা আবার তোর দাদাজিকে লুকিয়ে হুঁকো টানত।

— দাদাজিও কি তোমাকে মারত নাকি মা?

— না, তিনি কখনও উঁচুগলায় কথা পর্যন্ত বলেননি। মিথ্যে বলব কেন? কিন্তু সে বেচারা তো নিজেই কাঁটা হয়ে থাকতেন দাদীর ভয়ে। তোর দাদীটি তো সোজা মেয়ে নন!

মা তুমিও তো সোজা মেয়ে নও। যাকে ইচ্ছে জিজ্ঞেস করে দেখ। নিজের মনেই ও হাসে কথাগুলি ভেবে। মা এদিকে একঘেয়ে সুরে বকেই চলেছে। ও যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলেও মা এখন কথা বলে যাবে। ও অনেক সময় দেখেছে, মা একলা বসে নিজের মনেই কথা বলে।

মাঝে মাঝে হঠাৎ চুপ করে থাকছে একটুক্ষণ। হয়তো স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কোনও বিশেষ কথা বা স্মৃতি খুঁজে বের করছে।

— তোর বাবা তোর দাদাজির জন্যে মদ কিনে আনত। আসবার সময় পথেই তার থেকে দু'চার চুমুক খেয়েও নিত। মাঝে মাঝে রাতে ওঁর তাস চুরি করে এনে আমাকে বলত, এসো, তাস খেলি। এদিকে তোর দাদী টের পেয়ে গেলে আমার হত অশেষ দুর্গতি। পা টিপে টিপে পেছন থেকে এসে এমন এক থাপ্পড় দিত যে চোখে সরষে ফুল দেখতাম।

এই পাঁচালি এবার শেষ হলে বাঁচা যায়।

— এমন একটা গল্প বল না মা, যাতে ঘুম এসে যায়। বেশ একটা ভাল গল্প, একটা রাজার গল্প।

ও মায়ের কোলের মধ্যে গুটিসুটি মেরে ছোট্ট হয়ে শোয়।

— তারপর তোর বাবার চাকরি হল। আমি তো ঠাকুরকে লক্ষ লক্ষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভাবছি এবার তোর দাদীর হাত থেকে মুক্তি পাব। কিন্তু তাঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি কোথায়? তিনিও রইলেন আমাদের সঙ্গে। এত্তো এত্তো মাইনে পেয়ে সব টাকাটা এনে ঢেলে দিত মায়ের আঁচলে, আর আমি একটা পয়সার জন্যে হা-পিত্যেশ করে ...

মা আবার চুপ করে থাকে কিছুক্ষণ। টাকাকড়ির কথা উঠলেই মায়ের গলা যেন বুজে আসে।

— তখন তোর বাবার উপরি রোজগার ছিল অনেক। খরচও কম ছিল। পয়সা না দিয়েই পাওয়া যেত কত জিনিস। তোর দাদী পাড়ার লোককে বিলিয়ে দিত সে সব। আমার কপালে তার ছিটেফোঁটাও জুটত না। কত কষ্ট যে দিয়েছে আমায়।

কেন আমি ওর সেবা করব? কেন এখানে এনে রাখব শুনি? আমার জীবনের ভাল সময়টাই কাটল ওর লাথি-ঝাঁটা খেয়ে। বুকের মধ্যে কেউ উঁকি মারলে দেখবে একেবারে চড়া পড়ে গেছে। আমি একেবারে ফোঁপরা, কিছু নেই ভেতরটায়। অথচ কি-ই বা এমন বয়েস আমার! আমার ওপর যা ...

মা হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলেই চলেছে। বীরু হতাশ হয়ে ভাবে কখন কি করে এই বকর বকর থামবে। এতক্ষণে ওর একটু একটু ঘুমও আসছে। মা যদি গলাটা একটু নামিয়ে কথা বলে, তাহলে ও ঘুমিয়ে পড়তও হয়তো। কিন্তু মা কি আর নিচুগলায় কথা বলতে পারে? এখন আবার ও হলুদ আর তেল ঘি-র গন্ধ পাচ্ছে মায়ের কাপড় থেকে। মায়ের কোল থেকে সরে এসে ও চারপাইতে শোয়। চারপাইটা একেবারে ঝুলে গেছে। মনে হচ্ছে ও যেন একটা টবের মধ্যে পড়ে গেছে। মাঝে মাঝে মা একটা গল্প বলে, তাতে একটা রাজা আছে। সেই রাজা চিন্তায় পড়লেই একটা ভাঙা চারপাইতে গিয়ে শুয়ে পড়ে। ওদের বাড়ির সব চারপাইগুলোই তো ...

— আমি যে ওকে মদ খেতে বারণ করতাম, তাতেও তোর দাদী আমাকে বকাবকি করত। বলত, তুই ওকে মানা করার কে? ছোটলোকের বাড়ির মেয়ে! আমার ছেলেকে কথা শোনাতে আসিস, এত আস্পর্ধা তোর? নিজের চরকায় তেল দে গিয়ে! ... সারারাত কাঁদতাম, কেউ খোঁজও নিত না। রোজ মাতাল হয়ে বাড়ি ফিরত আর ফিরেই আমাকে মারত। আমার জায়গায় অন্য কেউ হলে ঠিক মরে যেত গলায় দড়ি দিয়ে।

মা সে-রকম একটা গল্প কেন বলতে পারে না যাতে এক রাজা থাকবে যার সাত রানী ...

— আমার সর্বাঙ্গে ব্যথা হয়ে যেত জানিস খোকা। নিজের মায়ের দিক থেকে উসকানি পেয়েই তো ও আরও বাঘের মতো ভীষণ হয়ে উঠত। আমি মুখ খুলতে না খুলতেই মা-বেটা দুজনে মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার ওপর।

... সবচেয়ে ছোটরানীকে রাজা সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন, ছোটরানীর নামটি ফুলরানী ...

— আমার কখনও অসুখ করলে তোর দাদী বলত, মিথ্যে বলছে। ওষুধ তো দুরের কথা, কি হয়েছে সেটুকুও কেউ জানতে চাইত না।

... একদিন ফুলরানীর অসুখ করেছে, রাজা তো সারারাত এপাশ ওপাশ করছেন, ঘুম আর আসে না চোখে। পরের দিন সকালে উঠেই রাজা মন্ত্রীকে ডেকে হুকুম দিলেন, দেখ, এখনই নগরে ঘোষণা করিয়ে দাও, ডুম ডুম ডুম ডুম ...

— কত দিন তো ও বাড়িই ফিরত না। ভয়ে আমার প্রাণ শুকিয়ে যেত। কিন্তু তোর দাদীর ভয়ে কারও সঙ্গে কথা বলতেও সাহস হত না। পাড়ার মেয়েরা জিগ্যেস করত, ও কোথায় গেল? শুনে আমার কান্না পেত। সব সময় ইচ্ছে করত

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করি। জানি না, হয়তো কোনও শক্তি কোথাও ছিল, যা আমাকে বাঁচিয়ে রাখত। না হলে এত দুঃখে ...

... ঘোষণা করিয়ে দাও, ডুম, ডুম, ডুম ... ফুলরানীর অসুখ। যে তার অসুখ সারিয়ে দেবে রাজা তাকে অর্ধেক রাজত্ব দিয়ে দেবেন ...

— জীবনের সেরা সময়টা তো এমনি করেই মাটি হয়ে গেছে রে খোকা। একটা দিনও সুখের মুখ দেখিনি, সত্যি বলছি বাবা।

হঠাৎ বীরুর খেয়াল হয় মায়ের গলায় কথা বলছে যেন একটা অসহায় ভিখারিণী। ওর নিজের গল্পের সূত্রটা কোথায় হারিয়ে গেল। ফুলরানী সেরে উঠবে, কি উঠবে না সেটা ও যেন ঠিক করে উঠতে পারে না। মা কাঁদছে আস্তে আস্তে। ওর ভয় হচ্ছে, মা যদি কান্না না থামায় তাহলে ও নিজেও বোধ হয় এবার কাঁদতে শুরু করবে।

— মা, তুমি কেঁদো না।

— আমার কপালে কান্না ছাড়া আর কিছু লেখা নেই রে। সারাটা জীবন কেঁদেই কাটল, কখনও সুখ পেলাম না। পাবও না কোনও দিন।

— মা, তুমি কেঁদো না। আমি তোমায় সুখ দেব মা। দেখে নিও।

মা চুমো খায় ওকে।

এবার ও একটু লজ্জা পেয়ে মুখ লুকিয়ে ফেলে মায়ের কোলে। পরের দিনও ও মায়ের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। নিজের ভবিষ্যৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে ও বোধ হয় ভারি অস্বস্তিতে আছে।

সাত

বাবা ক'দিন থেকে বাড়িতে শোয় না। সকালবেলা একবার আসে। দেবীর হাতে কিছু পয়সাকড়ি দিয়ে তখনই আবার চলে যায়। মা'র সঙ্গে কথাও বলে না। মা সারাদিন বিছানায় পড়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে গজর গজর করে। দাঁত কিড়মিড় করে। মাঝে মাঝে আরও বেশি রাগ হলে জিনিসপত্র মাটিতে ছুঁড়ে ফেলতে থাকে।

খোকাটা সব সময় শুয়ে আছে মায়ের সঙ্গে। একটুও ভাল লাগে না বীরুর। কেমন লাল্‌চে লাল্‌চে, ঠিক যেন ইঁদুরছানা। চোখগুলো বেজায় ছোট ছোট। কিন্তু মা তো তাকে সমস্তক্ষণ চুমো খাচ্ছে, আদর করছে। তবুও সারাক্ষণ ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। এখন আর কি, বাচ্চু, আর একটু বড় হও তখন বুঝবে ঠেলা, এত আদর্-টাদর সব ভুলে যেতে হবে।

কিন্তু আর কত দিন মা শুয়ে থাকবে? উঠছে না কেন? মনে তো হচ্ছে ভালই আছে। অবশ্য উঠেই বা কি এমন করবে? না ওঠাই ভাল। মা বিছানা নেওয়ার পর থেকে বাড়ির হালচাল বেশ বদলে গেছে। সময়মত খেতে পাওয়া যায়। অত ধোঁয়াও ওঠে না এখন। অন্ধকারও যেন কম লাগে। কিন্তু তবু মায়ের চেঁচামেচির কামাই নেই।

— আমি শুয়ে রয়েছি, তাই একেবারে নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ তো কিছু খোঁজ করবে না তাই রোজ রাতেই নিশ্চয়ই খুব টানা হয়, আর তারপর কোথায় কোথায় ঘোরা হয় কে জানে!

— কি টানে মা?

— মদ, আবার কি!

মা যদি একটু ভাল মেজাজে থাকত তাহলে মদ সম্বন্ধে বীরু আরও কিছু প্রশ্ন করতে পারত।

— আমার তো সন্দেহ, আজকাল জুয়োও খুব চলছে। রোজ যে পয়সাকড়ি দেওয়া হচ্ছে এ সব নিশ্চয়ই ওই জুয়োরই কৃপায়।

জুয়ো খেললে যদি পয়সা পাওয়া যায় তাহলে খারাপ কি? মা তো পয়সাই চায়!

— বীরু, তুই একদিন ওর পিছু নিতে পারিস? দেখে আসতে পারিস কোথায় যায়, কি করে?

পিছু নেওয়ার কথা শুনে হাসি পেয়ে যায় বীরুর, বাবা যেন চোর!

— সেই ল্যাংড়াটার বাড়িতে নিশ্চয় আসর জমানো হচ্ছে।

ল্যাংড়াটা আবার কে? মা দুনিয়াশুদ্ধ লোকের কি যে সব অদ্ভুত অদ্ভুত নাম দিয়ে রেখেছে। আর আসর জমানোটাই বা কি ব্যাপার? মা যে কি বলে তার মানে মা-ই জানে। বিছানায় বসে বসে সব সময় যত আজেবাজে কথা ভাবছে।

— দাঁড়া না, একবার সেরে উঠি, তারপর ল্যাংড়াটার বাকি ঠ্যাংটাও যদি না ভেঙে দিই তো আমার নাম জানকী নয়! আর ঐ জুড়িওয়ালার মাথার ঝুঁটিটা উপড়ে ওরই হাতে ধরিয়ে দেব দেখিস! বিছানা ছেড়ে উঠি একবার, তারপর দেখছি সব! কি পেয়েছে —

হে ভগবান, মা যেন কখনও না ওঠে বিছানা থেকে!

— বজ্জাতগুলোর সর্বনাশ হোক! এমন একটা কেউ নেই যে ওকে সোজা পথে চলতে সুপরামর্শ দেয়। লোকটাকে বিগড়ে দেওয়ার জন্যে সবাই একেবারে কোমর বেঁধে লেগেছে! সবাই মিলে ওর ভরাডুবি করাবে। নিজেরা ঠিক সময়ে সরে পড়বে, আর ও-ই কেবল ফেঁসে যাবে। এর মতো সরল সোজা লোক আমি আর দেখিনি কোথাও।

আর মা, তোমার মতো বাঁকা মেয়েমানুষও তো কেউ কখনও দেখেনি! নিজের এই নতুন অভ্যাসটা দেখে বীরু বেশ খুশি হচ্ছে। মা যা কিছু বলে ও নিঃশব্দে মনে মনে সেগুলোর প্রতিবাদ করে যায়। ওর মনে হয় মায়ের প্রত্যেকটা কথার ও মুখ চেপে ধরছে। সবাই বলে, বীরু আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে।

— কোথায় যায় সেটা একদিন খোঁজ নিয়ে আয় দেখি। ওদের আড্ডা কোথায় সে আমি বলে দেব তোকে। তুই একদিন গিয়ে দেখে আসবি রাতে আজকাল কোন্ আড্ডায় থাকে ...।

বাবা কি একটা টাঙ্গা যে আড্ডায় থাকবে? মা'র মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে, একটা কথাও ঠিক করে বলতে পারে না। মাকে চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া উচিত। চিড়িয়াখানার কথা মনে পড়তেই ওর হাসি পেয়ে গেল।

— মা, দেবী কোথায় গেল?

— কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে দেখ গে! ওটিও তো কম যায় না, একেবারে যেন স্বাধীন হয়ে গেছে। মা বিছানায় পড়ে আছে, কোথায় আমি বাড়িতে থেকে কাজকমগুলো সামাল দিই—তা ওসব খেয়াল কি আছে তার? টো টো করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া আর কিছু করার ফুরসতই নেই।

মাকে একটা সহজ প্রশ্ন করলেও ছ'মাইল লম্বা গল্প শুনতে হবে।

— সব সময় এর বাড়ি, তার বাড়ি টহল মেরে বেড়াচ্ছে হ্যাংলার মতো।

উটের মতো লম্বা হয়ে গেছে, এদিকে একটুও আক্কেল নেই ঘটে। ওর বয়সী মেয়েরা সারা সংসার সামলাচ্ছে, আর উনি সারাক্ষণ হি-হি করে বেড়াচ্ছেন, আর কোনও কাজ নেই।

তোমারও তো সারাক্ষণ চিড়বিড় করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই মা।

— রাত হয়ে গেছে। এটুকু হুঁশ নেই যে বাড়ি যাই, রুটিগুলো সেঁকে ফেলি, কারও খিদে পেতে পারে। যেমন সোয়ামি তেমনই মেয়ে—আমার কপালে সবই খারাপ।

এই রকম সব কথা মা যে কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে বের করে!

— লোকে কি বলবে সে খেয়ালও নেই। সারা পাড়ায় আর কোন মেয়ে নেই যে সারাটা দিন এমন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। নিজের মায়ের সঙ্গে কেবল ঝগড়া আর যারা মায়ের শত্তুর তাদের সঙ্গেই ওর গলাগলি। কি যে করি, আজকাল দেখছি কিছুতেই আর ভয় পায় না। কি করা যায়?

মা আরও কি কি বলতে চায় কে জানে। এসব শুনতে ওর ভীষণ খারাপ লাগছে। ইচ্ছে করছে উঠে গিয়ে মায়ের মুখে খানিকটা কাপড় গুঁজে দেয়।

— লোকে তো আমাকেই দোষ দেয় কি না, সবাই বলে আমি কেন মেয়েকে কিছু বলি না। যদি একটা কিছু অঘটন ঘটে যায় তখন তো আমারই বদনাম হবে। হে ভগবান, কি যে করি আমি! গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে! কবে যে একটু শান্তি পাব জানি না!

মা কোনও দিনও শান্তি পাবে না। কোনও দিন না!

— মা, বাবা আজকাল বাড়ি আসে না কেন?

— কে জানে কেন! কি আর বলব বাছা, বড় হলে তুই নিজেই সব বুঝতে পারবি।

আমি তো এখনই সব বুঝতে পারি মা। বুঝতে আর বাকি কি আছে? আর কত বড় ...

— তুই জানিস না কত কষ্ট সয়েছে তোর মা। আমি তো বেঁচে আছি শুধু তোর দিকে চেয়ে।

ফের সেই সব কথা—যেগুলো শুনলেই কান্না পায় আমার।

— তুই বড় হয়ে আমাকে সুখী করবি তো বাবা? আমার কথা শুনবি তো? আর তো কেউ কখনও সুখ দিল না আমায়। সবাই আমার শত্তুর। সবাই আমাকে জ্বালাবার জন্যে একেবারে কোমর বেঁধে বসে আছে। তুই ও রকম হবি না তো? তোর জন্যেই তো আমি বেঁচে আছি। কথা বলিস না কেন রে? বল না, বল ...

কি বলব, কিছু তো বুঝতে পারি না।

— হ্যাঁ মা, তোমাকে আমি সুখ দেব।

মা'র মুখ ঝলমল করে ওঠে। চোখে জল টলমল করে। মুখ ভরে যায় মিষ্টি রোদ্দুরের মতো হাসিতে।

— তোর কাছে এটুকুই আমার আশা। তুই যে আমার জীবনের ধন রে!

ওর কাঁধ দুটো কেমন যেন শিথিল হয়ে যায়, হঠাৎ ঘাড়ে যেন ভারী বোঝা চেপে বসেছে। উদভ্রান্তের মতো ও তাকিয়ে থাকে মায়ের দিকে। ওর মুখে একটা 'হ্যাঁ' শুনে মা যখন এত খুশি, তখন এই 'হ্যাঁ'র নিশ্চয়ই বেশ গুরুতর কিছু মানে আছে। ও আবার কোনও ভাবে ফেঁসে গেল না তো?

খোকাটা জেগে উঠেছে, মা ওকে কোলে তুলে নেয়।

— এ বেচারার খিদে পেয়েছে। আমার শরীরে কিছু থাকলে তো খাওয়াব।

মা নিজের কামিজ ওপরে তুলে বাচ্চাটাকে দুধ দিতে শুরু করল। কিন্তু দু'একবার টেনেই বাচ্চাটা উঁ উঁ করে কান্না জুড়ে দেয়।

— মা, খোকাটা কোথা থেকে এল গো?

— তোর মাথা থেকে!

ও হকচকিয়ে যায়। হঠাৎ আবার কি হল মায়ের, এখনই তো বেশ হাসছিল। ওর মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে, কি সব ভাবছে ও, কি দেখছে কে জানে। মা ওর দিকে তাকাচ্ছে না। বাচ্চাটা ট্যাঁ ট্যাঁ করছে, এখনই যদি চুপ না করে তো মা হয়তো ওর গলাই টিপে দেবে।

— মা!

— কি, বল না? বলছিস না কেন?

— তোমাকে খুব ভয় করে মা।

— আমি কি ডাইনি নাকি? আমাকে আবার ভয় কেন?

— মা, ওই ছেলেগুলো বলছিল, খোকাটা তোর মা'র পেট থেকে বেরিয়েছে। সত্যি না কি, মা? আমি ওদের বলেছি খোকাকে ভগবান পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুনে ওদের কি হাসি, বলল, তুই একটা আস্ত বোকা।

— ওই ছেলেদের সঙ্গে আর কথা বোল না।

— মা, ওরা বলে, তুইও তোর মা'র পেট থেকে বেরিয়েছিস।

— বললাম না, ওই সব বজ্জাতগুলোর সঙ্গে কথা বলতে হবে না।

— ওরা বলে, পৃথিবীশুদ্ধ সবাই নিজের মায়ের পেট থেকে বেরিয়েছে।

মা এবার হেসে ফেলে। মায়ের হাসি দেখে ও নিজের কথা ভুলে যায়। মায়ের মুখের ওপর কত রকম রেখা ফুটছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে — দেখতে দেখতে ও অবাক হয়ে ভাবে মায়ের হাসি আর কান্নার মধ্যে তফাৎ কতটুকু। মা কাঁদছে কেন? মায়ের মুখখানাই বোধ হয় এ রকম!

— মা, খোকাটা যেখান থেকে দুধ খাচ্ছে ওটাকে কি বলে?

— দুধ বলে, আবার কি?

— ছেলেরা বলছিল, ওটাকে মাই বলে।

— ছেলেগুলো ভারি শয়তান, যত খারাপ নোংরা কথা বলে। ওদের সঙ্গে কথা বলবার দরকার নেই।

— নোংরা কথা মানে কি মা?

— আমি জানিনে। তুমি বড্ড চালাক হয়ে গেছ। খুব বেশি কথা বলতে শিখেছ।

— আমিও ওইখান থেকে দুধ খাব, মা।

— বড় ছেলেরা এ দুধ খায় না।

—কেন?

— তারা বড় হয়ে গেছে বলে।

এই রকম এলোমেলো জবাবে ওর মনের সংশয় ঘুচল না, কিন্তু মাকে আর বেশি বিরক্ত করাও ঠিক হবে না। কে জানে, কোন্ কথায় আবার চটে উঠবে। মায়ের মেজাজ বদলাতে তো সময় লাগে না। কিন্তু এই সব ছোটখাট প্রশ্ন করে মাকে একটু উত্যক্ত করতে আজ ওর বেশ লাগছে।

— মা, দেবীর কবে খোকা হবে?

— ও রকম কথা বলতে নেই।

— কেন?

— আগে দেবীর বিয়ে হোক, তবে তো।

— বিয়ে না হলে বুঝি খোকা হয় না?

— পাগল কোথাকার!

তার মানে ছেলেগুলো ঠিকই বলে, আগে বিয়ে হয়, তারপর খোকা হয়। ওর মুখে আস্তে আস্তে একটু হাসি ফোটে। বেশ চালাকি করে ও একটা বড় খবর জেনে ফেলেছে। ছেলেগুলো সব ঠিক কথাই বলে। মায়েরই অভ্যাস মিথ্যে বলা।

— দেবীর কবে বিয়ে হবে মা?

— ভগবানই জানেন, বিয়ে হবে কি না শেষ পর্যন্ত! বাপ মাতাল, জুয়াড়ি। মেয়ে বেহায়া, বেআক্কেলে। বিয়ে হবে কিনা কে জানে! একটা পয়সার সংস্থান নেই, বিয়ে হবে কি আমার মাথা দিয়ে? ও নিজের সংসারে গেলে তো আমার ঘাড় থেকে বোঝা নামত। একমাত্র মেয়ে, মনে মনে কত আশাই ছিল আমার! হায়রে, একটা সাধও মিটল না!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজের কপালে হাত দেয় মা।

— আমি তো সবদিক থেকেই দুঃখী, কোনও সুখ তো পেলাম না। একটা পয়সা নেই আঁচলে। সন্তান নিয়ে যে সুখ পাব তাও হল না। বিয়ে হবে কি করে? আর কারও যখন কোনও চিন্তাই নেই তখন আমার কি দায় পড়েছে। চুলোয় যাক সব! আমি কেন শুধু শুধু প্রাণপাত করে মরি? এ বাড়িতে আমার কথা যখন কেউ শোনেই না, আমি কেন ওদের জন্যে ভাবতে যাব? বাপেরই যখন কোনও হুঁশ নেই তখন আমার কি দায়?

ও মায়ের কথার খেই ধরতে চেষ্টা করছে, কিন্তু মায়ের কথা যেন ঘুড়ির

সুতো, ওর হাত থেকে পিছলে পিছলে কেবলই বেরিয়ে যায়। ঘুড়ি ওড়ানোটা বেশ দারুণ ব্যাপার! আসলাম কি সুন্দর ঘুড়ি ওড়ায়, ঘুড়িগুলো যেন তারা হয়ে যায়। প্যাঁচ লড়ায়। সুতোয় এমন মাঞ্জা কষে যে হাতই কেটে যায়। কিন্তু এক আনার কমে তো ঘুড়ি পাওয়াই যায় না। পয়সা চাইলেও মা যত রাজ্যের কষ্টের কথা বলতে শুরু করে দেবে। সব সময় ও মায়ের কাছে বসে থাকে বলে ছেলেরা ক্ষ্যাপায়, বলে মায়ের খোকা। ওই ছেলেগুলোর মায়ের ...

অনেক রকম গালিগালাজ শেখা হয়ে গেছে। আসলাম খুব জোরদার সব গালাগাল জানে। সে বলে, গালাগাল হবে একেবারে বন্দুকের গুলির মতো, লাগলেই মাথা ফেটে যাবে। আসলাম দারুণ ছেলে! ও যদি কখনও আমার বন্ধু হয়ে যায়! বিপদের সময় যে কাজে লাগে, সে-ই তো বন্ধু। আর বিপদ তো ...

— বাপ কোথায় কি ছাইভস্ম ঘাঁটছেন কে জানে! মেয়ে কার কার সঙ্গে পিরিত করে বেড়াচ্ছে তাই বা কে জানে! একদিন এমন কেলেঙ্কারি হবে যে দেশসুদ্ধ লোক হাঁ হয়ে যাবে। তখন সবাই আসবেন আমায় দোষ দিতে। এখন তো কেউ শুনবে না আমার কথা। যদি শুনত কত ভাল হত।

আমি তো শুনছি! কই, কি ভাল হচ্ছে?

মা যে কি বকবক করে কে জানে। লোকে ঠিকই বলে, মা'র মাথাটাই খারাপ হয়ে গেছে। বাবা ওকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিলেই পারে। বাবা তো বলে, এটা বাড়ি নয়, পাগলা গারদ। বাবা নিজেও তো পাগলই, পাগল না হলে কি অমন করে নিজের মাথা ঠোকে? অন্যদেরও তো বাবা আছে। মা আছে। সেই সব মায়েরা তো আদর করে, কত মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। নিজেদের সংসারের সঙ্গে অন্যদের সংসারের তুলনা করাটাও ও শিখেছে নিজের বাড়ির লোকেদের কাছেই। দেবীকে বকতে হলেই মা বলে, 'অন্যদের ঘরেও তো মেয়ে আছে, কই তারা তো এমন করে না'। দেবীও পট করে জবাব দেয়, 'অন্যদের ঘরেও তো মা আছে, কই, তারা তো সব সময় তাদের মেয়েদের এমন শূলে চড়ায় না?' এই জবাব শুনে মা চিৎকার করে ওঠে, 'তুই অন্যদের মেয়েদের মতো হয়ে তো দেখা একবার।' দেবীর জবাব আসে, 'কি করে হব শুনি? তালি কি আর এক হাতে বাজে?' সে দু'হাতে তালি বাজাতে থাকে। দেবীর এই তালি দেওয়ার ব্যাপারটা মাকে ভয়ানক খেপিয়ে তোলে।

বাবার বিরুদ্ধে মায়ের যত নালিশ তাও শেষ পর্যন্ত ওই কথাতেই এসে পৌঁছায় — অন্যদেরও তো সোয়ামি আছে, তারা তো সারাদিন বাড়ি ছেড়ে এমন বাইরে ঘোরে না, মদ গেলে না, জুয়ো খেলে না — তারাও তো সব পুরুষ মানুষ!

বাবা কিন্তু অন্য মেয়েদের সঙ্গে মায়ের তুলনা করে না। বেশিক্ষণ তর্ক বা ঝগড়া করেই না বাবা। মায়ের মুখ দেখতেও বোধ হয় বিতৃষ্ণা হয় বাবার। কিন্তু মা কিছু বলতে না বলতেই বাবার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায়। বাবা কারও সঙ্গেই বেশি কথা বলে না। সব সময় কি যেন নিজের খেয়ালে আছে লোকটা।

— তুই যা বাছা, একদিন ওর পিছু নিয়ে দেখে আয় তো কি করে ও। আজ না হয় জিতছে কিন্তু কাল যদি হারতে শুরু করে তো ঘরে জল খাওয়ার গেলাসটা পর্যন্ত থাকবে না। তুই চিনিস না ওকে!

আমি কাউকেই চিনি না, চিনতে চাইও না। সব কটা যাক ... মায়ের কাছাকাছি সব সময় থাকতে থাকতে আমারও মুখ বড় খারাপ হয়ে গেছে। মায়ের কাছে বসে না থেকে, আমার উচিত বাইরে গিয়ে নিজের বয়সী ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করা। কি খেলব? যা হোক কিছু। এই অন্ধকার ঘরের কোণে বসে মায়ের বকবকানি শোনার দরকারটা কি? গোল্লায় যাক সবাই!

— এই দেবীর কাণ্ডটা দেখ একবার। যা তো বাবা, দেখে আয় কার বাড়িতে বসে আছে। যেখানেই থাক, চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে আসবি। নিজে থেকে সারারাতেও ফিরবে না।

কি জ্বালাতন! আমি কি কেবল সকলের পেছন পেছন ঘুরে বেড়াব? আর কি কোনও কাজ নেই আমার? স্কুলের পড়াগুলো কি মায়ের বাবা এসে করে দিয়ে যাবে? স্কুলের কাজ করে না নিয়ে গেলে কাল মাস্টার যখন প্রশ্ন করবে কি দেখাব তাকে? আমার মুণ্ডু না মায়ের মুণ্ডু? সমস্ত ছেলের সামনে মাস্টার বলবে, কি রে ছোঁড়া, সারা রাত কি মায়ের দুধ খাচ্ছিলি না কি? বল না! কি পাজি মাস্টারটা! মা জানতে পারলে ওকে কষে গালাগাল দিত ...

এই সময় পা টিপে টিপে দেবী এসে ঢোকে বাড়িতে। নিচের ঠোঁটটা চেপে রয়েছে, মুখে তর্জনী দিয়ে বীরুকে ইশারা করছে চুপ করে থাকতে। কিন্তু বীরু বোধ হয় ইশারার মানে বুঝত পারল না।

— মা, ঐ তো দেবী এসে গেছে।

— এসেছে? কি ভাগ্যি আমার! মা চিৎকার করে ওঠে, আরও কিছুক্ষণ পাড়া বেড়ালে পারতিস, এত শিগগির ফেরার কি দরকার ছিল?

দেবী চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে যেতে থাকে।

— বলি, যাওয়া হয়েছিল কোথায়?

— বাইরে।

— কি করতে গিয়েছিলি? মাথা মুড়োতে? লজ্জা করে না তোর? কতবার বলেছি বাড়িতে থাকবি! মা বিছানায় পড়ে রয়েছে, এটুকুও হুঁশ নেই তোর? বেহায়া কোথাকার!

— গালাগাল দিও না মা।

— বাঃ চমৎকার! চুরিও করব, চালাকিও করব! বাঃ!

— মা, যা বলবার সোজাসুজি বল।

— ওঃ, এত সাহস তোর! আমাকেও চোখ রাঙাতে শুরু করেছিস? উটের মতো ঢ্যাঙা হয়েছ, এদিকে লজ্জা-শরমের বালাইটুকু পর্যন্ত নেই? বাড়িতে থাকতে

তোর কি কষ্ট হয় শুনি? দশবাড়িতে না ঘুরলে কি খাবার হজম হয় না? যার সঙ্গে সারাদিন ...

— আমি এখন আর দুধের বাচ্চা নই মা।

— আহা হাঃ, দুধের বাচ্চা যদি হতিস তাহলে আমি তোর গলা টিপে দিতাম। জন্মাতেই কেন যে শেষ করে দিইনি! তোর মতো সন্তান যেন ভগবান শত্তুরকেও না দেন!

এই যুদ্ধ এখন কতক্ষণ চলবে কে জানে। বীরুর ইচ্ছা করছে চুপচাপ উঠে বাইরে চলে যায়। কিন্তু এই অন্ধকারে যাবেই বা কোথায়?

— মুখ সামলে কথা বলবে মা!

— কুত্তি, কমিনা, নির্লজ্জ, তুই মর!

— ঠিক আছে, বলেই যাও, যত খুশি বলে যাও।

— সব জানা আছে আমার! তোর সব বজ্জাতি আমি বুঝি। আমাকে উঠতে দে আগে, তারপর মজা দেখাব। আমাদের মুখে চুনকালি দিয়ে ছাড়বি তুই!

— মা, সব জিনিসেরই একটা সীমা আছে।

— বেহায়া কোথাকার! লজ্জা-শরমের মাথা একেবারে খেয়েছিস।

— মা, নিজের মান রাখতে জানতে হয়।

— নে, নে ঢের হয়েছে! আমাকে উনি শেখাতে এসেছেন! তোর মতো অমন অনেক ইয়ে দেখেছি আমি! লোকে তোর নামে কি বলে তা জানিস? বলে খানকি, লোচ্চা!

— বাজে কথা বন্ধ কর মা।

— বাজে কথা!

— তাছাড়া আবার কি? আর কারও মা নিজের মেয়েকে এই সব নোংরা গালাগাল দেয়, শুনেছ?

— আর কারও মেয়ে কি তোর মতো বজ্জাত?

— কি করেছি আমি? কেন পেছনে লাগছ শুধু শুধু?

— কি করেছিস জানিসনে তুই? আমাকে উঠতে দে একবার। সারা পাড়ার সামনে হাটে হাঁড়ি ভাঙব। কিসের এত অহঙ্কার তোর শুনি?

— তোর যা খুশি করে দেখ না একবার! তুই তো আমার মা ন'স, তুই আমার শত্রু।

— তুই কি আমার মেয়ে নাকি? তুই আমার সতীন, বুঝলি সতীন!

— মা, একটু বুঝে শুনে কথা বল!

কুকুররাও নিজেদের মধ্যে এমন ঝগড়া করে না। এদের ঝগড়া শুনতে শুনতে বীরুর মাথার শিরাগুলো টনটন করতে থাকে। মনে হয়, দু'দিক থেকে ওর দুই গালে চড় মেরে চলেছে কেউ। কানগুলো জ্বালা করে, দু'চোখে যেন ছুঁচ ফোটে।

— কে শুনবে তোর কথা? কেউ তো তোকে এক সের আটাও ধার দেয় না। আমি না থাকলে উপোস করে মরতিস।

— আচ্ছা, এবার তুই এই নিয়েও দেমাক দেখাচ্ছিস! ঠিক আছে।

ওর মনে হচ্ছে মাথাটা বুঝি ফেটে যাবে। ভেতর থেকে একটা প্রবল ধাক্কা খেয়ে ও চিৎকার করে ওঠে — চুপ কর!

দেবী আর মা দুজনেই ওর দিকে এমন ভাবে তাকায় যেন এর আগে ওকে কখনও দেখেনি।

ও একবার এর দিকে, একবার ওর দিকে তাকাতে থাকে পালা করে। ওর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। ইচ্ছা করছে, গেলাসটা তুলে নিয়ে দেবীর মুখের ওপর ছুড়ে মারে, মাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে, নিজের মাথাটা দেওয়ালে ঠুকে ঠুকে ভাঙে আর চিৎকার করে কাঁদে। এমন একটা কিছু করতে ইচ্ছা করছে, যাতে সবাই ওর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। ও যেন পাগল হয়ে গেছে।

— ইনিই বা কম কিসে! অন্যেরা যা করবে এও তো ঠিক তাই করবে, মা বলে ওঠে।

— চুপ কর! আবার চেঁচিয়ে ওঠে ও।

মাটি থেকে গেলাসটা তুলে ও মায়ের দিকে ছুড়ে ফেলে। দেওয়ালে লেগে গেলাসটা বিছানায় গিয়ে পড়ে। খোকাটা চেঁচিয়ে কেঁদে ওঠে।

দেবীর দিকে তাকিয়ে ও চিৎকার করে — লোচ্চা, খানকি!

দেবী এক চড় কষিয়ে দেয় ওর গালে সজোরে। ও কাঁদে না, বরং এমন ভাবে তাকায় যেন আরও একটা চড় আশা করছে।

দেবী চুপ করে চেয়ে থাকে ওর মুখের দিকে।

দুজনের চোখেই এবার জল ভরে আসে।

মা বিছানায় পড়ে পড়ে বিলাপ করছে — হায়, হায় ...।

আট

পা টিপে টিপে ও চলেছে বাবার পিছনে পিছনে। বাবা নিজের মধ্যে একেবারে মগ্ন হয়ে পথ চলছে, অন্য কোথাও নজর নেই। মাথা ঝুঁকিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটছে, মনে হচ্ছে পথে বুঝি কিছু হারানো জিনিস খুঁজছে। এতই আস্তে আস্তে এগোচ্ছে যে তার পিছনে থাকাই মুশকিল। ওকে বার বার থেমে দাঁড়াতে হচ্ছে। আজ ও খবর নিয়ে ফিরবে, বাবা কোথায় যায়। বহ্‌রাম ডাকাতের গল্প ওর জানা আছে।

বাবা যে গলি দিয়ে হাঁটছে সেটাতে অগুনতি মোড় আছে। ও গলিটার নামই বাঁকা গলি। প্রতিটি মোড়ে এসে বাবা কেমন যেন থমকে দাঁড়ায়—সামনে কোনও পাঁচিল থাকলে লোকে যেমন করে। মনে হচ্ছে, বাবা কিছু নিয়ে খুব চিন্তা করছে। এও হতে পারে যে বাবার হাঁটার ধরনটাই এমন। মা তো বলে, বাবা সব সময়ই নেশার ঘোরে থাকে। কিন্তু মায়ের একটা কথাও ও বিশ্বাস করে না।

বাবা যদি হঠাৎ পিছন ফিরে ওকে দেখে ফেলে, তাহলে ... বুকের মধ্যে ধক করে ওঠে, জিভ বেরিয়ে আসে দুই ঠোঁটের মাঝে, ভাল-মন্দ বেশ কয়েকটা অজুহাত মাথায় খেলে যায়। বলে দেব, আসলামের বাড়ি যাচ্ছি ... মাস্টারজি ডেকেছে ... মন্দিরে যাচ্ছি ... দেবীর বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছি। বাবা তো একদম ভোলানাথ, যে কোনও একটা অজুহাত বলে দিলেই চলবে।

একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে বাবা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। বাবা জানান দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটু কাশে তারপর ওপর দিকে তাকায়। আবার কাশে, তারপর মাথা নিচু করে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন মাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খুলে যায়, বাবা সেই রকম মাথা নিচু করেই ঢুকে যায় ভেতরে। এবার দরজাটা যেন নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে যায়। বহ্‌রাম ডাকাতের সেই চোরাকুঠুরির কথা মনে পড়ে যায় ওর — যেখানে সে শাহ্‌জাদীকে বন্দী করে রেখেছিল। ও দৌড়ে দরজাটার কাছে গিয়ে এক ধাক্কা মারে, কিন্তু ফিরে আসতে হয়। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে গেছে। কার বাড়ি এটা কে জানে।

গলিটা একেবারে নির্জন। আশেপাশের বাড়িগুলো সব ভাঙাচোরা, বোধ হয় লোক থাকে না এ সব বাড়িতে। বাবা যে বাড়িটাতে ঢুকল সেটাতেও বোধ হয় কারও বাস নেই। বিকেলের সোনালি রোদ্দুর ক্রমশ কালচে হয়ে আসছে। সন্ধ্যেবেলায় এই গলিতে ও কখনও আসেনি। ওপর থেকে কিসের শব্দ আসছে, শোনবার চেষ্টা করে। ডিঙি মেরে গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়ায়, কান খাড়া করে শোনে। কেমন যেন তালগোল পাকানো শব্দ। মনে হচ্ছে, বেশ ভারী গলায় অনেকে মিলে গান গাইছে। সুরটা বেশ অদ্ভুত। ও কি এখন এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে না বাড়ি ফিরে যাবে? দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি? দরজা তো বন্ধ। কিন্তু ফিরে যাওয়ার কোনও তাড়া তো নেই। বাবা আবার নিচে নেমে আসতেও তো পারে। তাহলে বাবার সঙ্গেই ফেরা যায়, একলা এতটা রাস্তা যেতে তার যে ভয় করবে। ওর মুখের ওপর এবার দুশ্চিন্তার কয়েকটা রেখা ফুটে ওঠে।

অন্ধকার আরও এগিয়ে এসেছে। সন্ধ্যার মুখে আরও একপোঁচ কালি লেপে দিয়েছে এখন। ও দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। — কেউ যদি প্রশ্ন করে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন, তাহলে ওকে কিছু একটা উত্তর তো দিতে হবে! ও দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে মাটি কুরে কুরে তুলছে। ছোটবেলায় ওর মাটি খাওয়ার অভ্যাস ছিল। মা ওকে দিয়ে বাজার থেকে মাটি আনাত। ... মাটি খেতে হয় না ... পেটে লম্বা লম্বা কৃমি হয়ে যায় ...

মা একদিন একটা দোকান থেকে মাটি চুরি করেছিল। দোকানদার দেখে ফেলে, মা তখন কান্না জুড়ে দেয়। তখন মা'র বয়স দশ কিম্বা পনের বছর হবে। মা'র চোখে দশ আর পনেরতে বিশেষ তফাৎ নেই।

নখে অনেক মাটি লেগে গেছে। আজকাল ও আর মাটি খায় না। এখন তো মা-ও আর খায় না। কে জানে, খেতেও পারে, হয়তো লুকিয়ে লুকিয়ে খায়।

কার যেন পায়ের আওয়াজ শুনে ও চমকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পাশ দিয়ে একজন বুড়ো যাচ্ছে।

— এ বাড়িটা কার? ও প্রশ্ন করে।

— আমার বাপের। লোকটা ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দেয়।

ও লোকটার পিছনে দু'এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে। এই লোকটার কথাবার্তা মায়ের মতোই, ঠিক যেন মায়ের ভাই। ও আবার দেওয়াল খুঁটতে থাকে। ওপর থেকে এখনও সেই আওয়াজটা শোনা যাচ্ছে। এখন আগের থেকে আরও একটু স্পষ্ট। তবু পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না কিছু।

অন্ধকার এখন বেশ গাঢ়। মনে হচ্ছে টানা কয়েক ঘণ্টা ও যেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। কেন দাঁড়িয়ে আছে তাও একসময় ভুলে যায়। ক্লান্তি আর দুর্বলতায় পা দু'খানা ভেঙে পড়ছে। ভয়ও করছে বেশ। সব মিলিয়ে কেমন একটা উদ্দেশ্যহীনতা ওকে এবার গ্রাস করতে থাকে। ও বসে পড়ে মাটিতে। ঘাসের একটা শিষ তুলে

চিবোয়। সকালে দুটো মোটে রুটি খেয়েছিল। এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে। মনে হচ্ছে, বুকের ভেতর থেকে কেউ যেন ওকে দুটো আলাদা আলাদা দিকে টানছে।

বাবা কখন বাইরে আসবে কে জানে! আমার খিদে পেয়েছে আর উনি ভেতরে বসে হাসছেন! ওর রাগ ক্রমেই বাড়ছে, যেন বাবা ওকে এখানে বসিয়ে রেখে ভেতরে ঢুকে ওর কথা ভুলেই গেছে। ওপরতলার ঘরের একটা জানলা এবার খুলে গেল। এক পশলা হাসি এসে আঘাত করল বাইরের দেওয়ালে। সেই সঙ্গে কিছুটা আলোর ঝলক গলির অন্ধকারে এসে পড়ল একফালি হলুদ কাপড়ের মতো।

চমকে উঠে দাঁড়ায় ও। জানলা দিয়ে ভেসে আসা আওয়াজের মধ্যে বাবার গলার স্বর চিনতে পারে।

— ওহে, আমাকেও একটু দেবে তো!

গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়ে শুনছে ও। ঘরের মধ্যে আবার নিস্তব্ধতা। গলির অন্ধকারে আলোর টুকরোটা স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে। ওর খালি পায়ের তলায় যেন কেঁচো কিলবিল করে উঠল। গলা চিরে ও এবার চেঁচিয়ে ওঠে — বাবা! বাবা! সেই সঙ্গে ধাক্কা দিতে থাকে দরজায়।

দরজা খুলে যায়।

— কে তুমি? কি চাও?

ও ধাক্কা দিয়ে কাকে যেন ঠেলে অন্ধের মতো সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করে। এই অন্ধকারে এই সিঁড়িতে চড়া যেন ওর কাছে নতুন ব্যাপার নয়!

একটা মলিন কুপির আবছা আলোতে বসে থাকা লোকগুলো চোখ তুলে তাকায় ওর দিকে। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সিঁড়িতে। ঘরের মধ্যে ওর দৃষ্টি এলোমেলো ভাবে ঘুরছে, যেন কাঁপা হাতে কেউ একটা পুঁটলি খোলার চেষ্টা করছে। ওর পায়ে যেন জোর নেই একটুও।

নিস্তব্ধতা বাড়ছে ক্রমশ। মনে হচ্ছে ঘরের মধ্যে স্তব্ধতার বেলুনটা ক্রমশ ফুলছে। বেলুনটা ফেটে গিয়ে নানারকম আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ল। বলের মতো শব্দগুলো ঘরের চার দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে লাফিয়ে উঠছে।

ও সিঁড়ির মুখের জায়গাটা থেকে এগোল।

— বীরু, তুই এখানে!

— ও, এই রাজপুত্তুরটি তাহলে তোমার?

যে লোকটা ওকে বীরু থেকে রাজপুত্তুর বানিয়ে দিল তাকে চেয়ে দেখল ও।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার কি তাতে কিছু আপত্তি আছে? হাতের গেলাসে একটা চুমুক দিয়ে কথাটা বলে বাবা।

— আপত্তি আমার কেন হবে? যার হওয়ার কথা তারই যখন হচ্ছে না।

কয়েকজন হেসে ওঠে কথাটা শুনে। বীরুর পালাতে ইচ্ছা করছে। এদের কথা সে বুঝতে পারছে না। এদের মধ্যে কেউ কি ওর চোখে খানিকটা নুন ঢেলে

দিয়েছে? চোখ রগড়ে রগড়ে সব নুনটা বার করে দিতে চায় ও, কিন্তু চোখ রগড়ালে আরও বেশি জ্বলছে।

চোখ রগড়ানো বন্ধ করে ও, কিন্তু জল পড়তেই থাকে। ... কখন যে কান্না থামল সে ঠিক মনে করতে পারে না, কিন্তু এত লোকের সামনে কেঁদে ফেলার জন্যে বেশ লজ্জা করছে। দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বীরু। দেওয়ালে পেনসিল দিয়ে কি সব লেখা ও পড়তে চেষ্টা করে।

— আরে বোস না ইয়ার, এরই মধ্যে যাচ্ছ কেন?

— একে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি।

— ও নিজেই চলে যাবে। তুমি একবার বাড়ি গেলে আর ফিরবে না সে আমরা জানি। কি হে রাজপুত্তুর, একলা বাড়ি ফিরতে পারবে না?

ও বাবার দিকে তাকায়, তারপর মাথা নেড়ে জানায়, পারবে না। বাবা হাতছানি দিয়ে ওকে কাছে ডাকে।

— এখানেই বসিয়ে রাখ না, পয়সা নিয়ে খেলা করবে এখন।

বাবা একটা হাত ওর পিঠের ওপর রাখে। অন্য হাতে গেলাসটা মুখের কাছে তুলে পেচ্ছাপের মতো হলদে রঙের জলটা ঢকঢক করে গিলে নেয়। গোঁফে হলুদ ঘাসের মতো খানিকটা লেগে রয়েছে, মুখখানা কেমন শক্ত হয়ে উঠেছে।

— তাস দেব তো?

— হ্যাঁ।

বাবার মুখের শক্ত ভাবটা একটু একটু করে শিথিল হচ্ছে। ওর পিঠের ওপর বাবার হাতখানাও ভারী হচ্ছে ক্রমে। বাবা যেন একটা ভারী বোঝা ওর পিঠে নামিয়ে দিয়ে ভুলে গেছে। বাবার সামনে পয়সার স্তূপ আর হাঁটুর তলায় একগোছা নোট। ও যদি ছোঁ মেরে নোটগুলো তুলে নিয়ে দৌড়ে পালায়, আর মায়ের গায়ে নোটগুলো বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে ঢেলে দেয় তাহলে...তাহলে মা নিশ্চয়ই খুব হেসে উঠবে। মায়ের সব দুঃখ দুর হয়ে যাবে। মা বলবে, বাছা, তোরই তো আমাকে সুখ দেওয়ার কথা ছিল, তুই ঠিক সুখ এনে দিলি। এবার যা, গিয়ে খেলা কর। তারপর রাতে বাবা যখন বাড়ি ফিরবে মা ছমছম করে মল বাজিয়ে উঠে গিয়ে খাবারের থালা এনে রাখবে বাবার সামনে, সে থালায় এত খাবার জিনিস থাকবে যে পেঁয়াজটুকু রাখারও জায়গা নেই।

— পয়সা নিবি?

বাবা একমুঠো খুচরো পয়সা ভরে দেয় ওর পকেটে। পয়সার ভারে পকেট ঝুলে পড়ে। ও ভুলে যায় মায়ের কথা।

— আমার গেলাস যে খালি পড়ে আছে ইয়ার!

বাবা যদি বাড়িতেও এই এমনই সুরে কথা বলত তাহলে বাড়ির আবহাওয়াই বদলে যেত। কিন্তু বাড়িতে বাবা তো থাকেই না। যখন থাকে তখন আপিসের কাগজপত্রের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে। নয়তো ঝগড়া করে মায়ের সঙ্গে।

বাবার হাতে তিনখানা তাস। নিজের কাছে রাখা পয়সার স্তূপ থেকে পয়সা তুলে তুলে ফেলছে। স্তূপটা ক্রমশ ছোট হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আর কিছুই রইল না। এবার বাবার হাত এগিয়ে এল বীরুর পকেটের দিকে। বাবার দৃষ্টি কিন্তু হাতের তাসগুলোয়। বীরু নিজের পকেট চেপে ধরে, কিন্তু বাবা এক ঝটকায় তার হাত সরিয়ে সব পয়সা বের করে নিয়েই মাঝখানে ছুড়ে দিয়ে বলে ওঠে, 'দেখাও'।

যে লোকটা সামনে বসে ছিল সে প্রথমে নিজের তাসগুলো মেলে ধরে। তারপর পড়ে থাকা পয়সাগুলো সব গুছিয়ে তুলতে শুরু করে দেয়। বাবা নিজের তাসগুলো ফেলে দিয়ে গেলাস তুলে নিয়ে চুমুক দেয়। মুখখানা আবার বন্ধ মুঠির মতো কঠিন হয়ে উঠেছে। ওর পিঠের ওপর বাবার হাত এখন যেন পাথরের মতো ভারী।

এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়, বাবা বোধ হয় যা কিছু খেয়েছে সব বমি করে ফেলবে।

— বাড়ি যাব।

— এখনই যাব বাবা।

— চল না।

— আর একটু বোস। এখনই যাব।

— মা ...

— ব্যস, একদম চুপচাপ বসে থাক!

খেলা আবার শুরু হল। তাস দেওয়া হয়ে গেছে। বাবা নিজের পায়ের নিচে থেকে নোট বের করে সামনে ফেলছে। বীরু চিন্তিতভাবে চেয়ে থাকে বাবার দিকে। একটু পরেই ওর চোখে চিন্তার জায়গায় তন্দ্রা নেমে আসে। সকলের মুখগুলো ঝাপসা হয়ে আসছে।

ঘরের মধ্যে একটা অদ্ভুত নিস্তব্ধ ভাব, একটু আগেকার সব হাসি ঠাট্টা এখন চাপা ঠোঁটের আড়ালে অদৃশ্য। সকলের নজর মাঝখানে পড়ে থাকা নোটগুলোর দিকে, যেন প্রত্যেকেই সেগুলো নিজের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টায় আছে।

ও এক এক করে সকলের মুখের দিকে তাকাতে থাকে। প্রত্যেককে যেন চিনে রাখতে চেষ্টা করছে। ভাবছে একে আগে কোথায় দেখেছে। এ ঘরের মালিক কোন্ জন? ঘরে একটা সতরঞ্চি, সবাই যার ওপর বসে রয়েছে, আর একটা কুপি। আর কিচ্ছু নেই। এ রকম ঘরের কি কেউ মালিক থাকে? থাকতেও পারে। দেওয়াল জায়গায় জায়গায় ভাঙা, ঠিক যেন বাবার জুতোর মতো। বাবার ছেঁড়া জুতোর ফাঁক দিয়ে দু'তিনটে আঙুল বেরিয়ে থাকে, দেখলে মনে হয় ওগুলি যেন বাবার নিজের আঙুলই নয়। দেওয়ালগুলোয় মাঝে মাঝে কেমন যেন ছোপ ছোপ দাগ।

— একে তুমি সব সময় নিজের পাশে বসিয়ে রেখ।

বাবা নোট গুছিয়ে তুলছে। এত নোট, এগুলো সব যদি মা পায় তো আনন্দে

পাগল হয়ে যাবে। সব বাবাই নিয়ে নিল, বাকি লোকগুলো এখন কি করবে? সবাই মিলে যদি বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেয়? এগুলো সব আমার পকেটে ভরে দিয়ে যদি জোরসে একটা ফুঁয়ে বাবা আমাকে একদম উড়িয়ে দিতে পারত — উড়ে গিয়ে একবারে মায়ের সামনে পড়তুম। বাবা তারপর বাড়ি না এলেও কিছু যায় আসে না। মা'র তো পয়সা পেলেই হল!

— আচ্ছা, এবার আমি চললাম।

— এটা কোন্ দেশী কায়দা জনাব? নিজে একটা ভাল হাত পেয়েই অমনি উঠে পড়া? বোস এখন, এত তাড়া কেন? ওকে কিছু খেতে দিলেই হয়, পকৌড়া এখনও আছে বোধ হয়।

— এর ঘুম পেয়ে গেছে।

— ঘুম পেয়েছে তো ঘুমিয়ে পড়ুক। বাড়িতে কি ওর জন্যে মখমলের বিছানা পাতা আছে নাকি? তোমার কোলে মাথা রেখে ঘুমোক না।

— ঘুমিয়ে পড়লে, কে ঘাড়ে করে নিয়ে যাবে শুনি?

— তুমি! আবার কে?

— আমি? আরে ইয়ার, বাইরে বেরিয়ে আমার হুঁশ থাকবে নাকি? ঠিক আছে, এসো আর দু'তিন হাত খেলছি, না হলে তো সারা জীবন কথা শোনাবে।

বাবা আবার কিছু পয়সা রাখে ওর পকেটে। খেলা শুরু হয়ে যায় আবার।

সব গেলাসগুলো খালি হয়ে গেছে। দেওয়ালের পানের পিকের ছোপগুলো যেন নড়ে নড়ে বেড়াচ্ছে। ছাদের কড়ি-বরগা থেকে মাকড়শার জাল ঝুলছে। কুপিটা প্রায় নিভু-নিভু। মেঝের ওপর পাতা সতরঞ্চির কোণাগুলো যেন উড়ে এসে এক জায়গায় মিশে যাচ্ছে আর বসে থাকা লোকগুলো সতরঞ্চির গাঁটরিতে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে। ও একলা কেবল গাঁটরির বাইরে। দেওয়ালের ফাটলগুলো চলন্ত রেখার মতো নড়েচড়ে জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আর জট খোলার চেষ্টায় ও জড়িয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে। ও নিজেও যেন সব মিলে একটা বাঁকাচোরা রেখা। আবার হঠাৎ দেখে, চটপট যে যার জায়গায় চলে গেছে, গাঁটরিটা খুলে গেছে। ও নিজেও বসে আছে আগের জায়গাতেই। রেখাগুলো সব এখন আলাদা আলাদা। কুপি থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। আমাদের বাড়ির কুপি থেকেও এমনই ধোঁয়া বেরোয়। মা তো পরিষ্কার করতেও পারে না। কতবার তো সাফ করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছে। মা বলে, তেলে মাটি মেশানো থাকে বলে কুপির এত ধোঁয়া। আজ তো তেলও ছিল না বাড়িতে। কুপি জ্বলেনি নিশ্চয়ই। মা দরজায় বসে বসে রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করছে — আমার বীরুকে দেখেছ নাকি?

মায়ের কথা মনে পড়তেই ঘুম ছেড়ে গেল।

— বাবা, এবার বাড়ি চল না।

— এই তো, এখনই যাব রে একটু বোস।

বাড়িতে তো কখনও বাবা ওকে 'বাবা' বলে না। সব সময়ই মেজাজ চড়েই থাকে। আর এখানে কি মিষ্টি করে বলছে, যেন...

— আরে ইয়ার, ছেলেটাকে ঘুম পাড়িয়ে দাও না।

— তুমি নিজের চাল দাও তো! ছেলেটা তোমাকে তো কিছু বলছে না।

— ছেলে নয় বলছে না, কিন্তু ছেলের বাপের অবস্থা তো ভাল ঠেকছে না।

ও মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে চোখ মেলে তাকায়। বাবার হাঁটুর নিচে আর একটাও নোট নেই, মুখখানাও একেবারে ঝুলে পড়েছে, মনে হচ্ছে থুতনিটা এখনই খুলে পড়ে যাবে। বাবার মুখের চেহারা যখন এ রকম হয় তখন খুব বিপদ ঘটে। ভয়ে ওর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এখন বাবা যদি সমস্ত রাত বসে থাকে তাহলেও ও আর কিছু বলবে না। বাড়ি যাক, বা না যাক। যখন খুশি যাবে। এখন কথা বললেই থাপ্পড় খেতে হবে। বাবার হাতে যা জোর, বছরে একটা থাপ্পড়ই যথেষ্ট। মাস্টারের দশটা চড়ের সমান বাবার হাতের একখানা থাপ্পড়! দরকার নেই বাবা কথা বলে। ও চুপচাপ গুটিসুটি মেরে বসে থাকে।

— পাশা পালটে গেছে।

— হ্যাঁ।

— আর দু'এক হাত হবে?

— আর কি বাকি আছে?

— এই নাও পাঁচ টাকা। তাস বাঁটো।

বাবার হাত চলে খুব জোরে, ঠিক যেমন মা'র মুখ চলে। হাতখানা এখনও ওর পিঠের ওপর। এক হাতে বাবা কি করে তাসগুলো সামলায় কে জানে! ওর ইচ্ছে করছে পিঠ থেকে সরিয়ে দেয় বাবার হাতখানা। বাবা বোধ হয় ভুলেই গেছে যে বাবার হাতখানা ওর পিঠে। ওর কোমর ব্যথা করছে। এক জায়গায় না রেখে বাবা যদি পিঠের ওপর হাতখানা বুলোয় তাহলে ব্যথাটা একটু কমে। বাবা এতক্ষণে হাতখানা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে বসল।

চিমনিটা একেবারে কালো ঝুল, এখন তো তাসও দেখা যাচ্ছে না ভাল করে।

— তাড়াতাড়ি খেল, তেল শেষ হয়ে আসছে।

— হ্যাঁ, এই নাও।

— এই নাও।

— আচ্ছা, ঠিক আছে, আরও এক চাল।

— দেখিয়ে দাও

— এই নাও।

— আমার খিদে পেয়েছে বাবা।

— ব্যস, এই বার যাব।

ও আড়ামোড়া ভাঙে। কপালটা এত কুঁচকে আছে যে ও যেন এই

লোকগুলোর ঠাকুর্দা। দু'চোখে ওর অসীম ক্লান্তি, বাবা আর তার সঙ্গীদের দিকেও এমন ভাবে তাকায় যেন এদের সবাইকে গালি দিচ্ছে।

— এবার তো যাবে বাবা?

— হ্যাঁ, এবার যাওয়া দরকার।

— সবাই তো যাচ্ছে এখন।

— না ইয়ার, আর একটু বোস।

— আচ্ছা।

— আচ্ছা চলি।

— আচ্ছা।

বাবা হাতের ওপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। জুতো পরতে গিয়ে টলমল করে পড়ে যাওয়ার উপক্রম। ওর কাঁধ ধরে সামলায়, অন্যেরা হেসে ওঠে। বাবার পা দুটো জুতোয় না ঢুকে এদিক ওদিক পিছলে যাচ্ছে।

— ব্যাপার কি? আজ নেশাটা বেশি চড়ে গেছে?

— ওর আজ অবস্থা কাহিল।

— সত্যি!

— তাছাড়া আবার কি?

— দেখছ না কেমন টলমল করছে!

— এই হারামিগুলো, চুপ কর!

বাবা বসে বসে জুতো পরতে থাকে। ও চেয়ে চেয়ে দেখে বাবার আঙুলগুলো কি রকম কাঁপছে। অন্য সবাই খুব হাসছে।

নিচে কেউ দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। বাবা চট করে উঠে দাঁড়ায়। সবাই কি সব বিড়বিড় করছে। বাবাই কেবল চুপ।

— কে?

— দরজা খোল, কে বলছি এখনই।

— কে?

সবাই বাবার দিকে তাকায়।

— মনিব তো তোমার! যাও, খোল গিয়ে দরজা।

মায়ের গলা চিনতে পেরেছে বীরু। কিন্তু মা টের পেল কি করে যে ও এখানে আছে? ও বাবার হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। বাবা হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যায় জানলার দিকে। বাইরে মাথা বের করে চিৎকার করে ওঠে, চুপচাপ চলে যাও, নইলে মেরে হাড়গোড় ভেঙে দেব!

— যাব না। আজ তোমাদের সব কটাকে মজা না দেখাই তো আমার নাম বদলে দিও! নিচ থেকে মা'র জবাব শোনা গেল।

— মা, আমিও এখানে। তুমি যাও, আমি বাবাকে নিয়ে আসছি।

— আচ্ছা, তাহলে তুমিও এখানে? নিচে এস একবার, তোমাকেও দেখে নিচ্ছি! যেমন বাপ, তেমনই বেটা! খোল দরজা, না হলে ভেঙে ফেলব।

— আরে বাবা, খুলে দাও না। না হলে সারা শহর এখানে এসে জড়ো হবে যে!

অন্ধকারে মায়ের চেহারা দেখা যাচ্ছে না। বাবা মাথা ঢুকিয়ে নিল ভেতরে। কুপির শিখাটাও যেন কাঁপছে মায়ের ভয়ে। মা যেন পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে এসেছে। মায়ের গলার কর্কশ আওয়াজ অন্ধকারের স্তর চিরে ওপরে উঠে আসছে। মা যদি কোনও রকমে ভেতরে এসে পড়ে তাহলে কি হবে? বাবার চোখ দিয়ে রক্ত ফেটে বেরোচ্ছে। বাকিরা দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে, যেন চারদিক থেকে ওদের ঘিরে ফেলা হয়েছে।

একটু সময় কেটে গেল। নিচে দরজায় ইঁট মারছে মা। মায়ের উন্মত্ত ক্রোধের মতোই দরজার শিকলগুলোও যেন ঝনঝন করে উঠছে।

— কি করা যায় ভাই, আমাদেরও তো দেরি হয়ে যাচ্ছে।

— ওহে, চটপট কেটে পড়, নইলে আমাদের মনিবরাও এসে জুটতে পারেন।

— ওঃ, তামাশা পেয়েছ নাকি?

— আমরা তো বৌকে অমন মাথায় চড়াইনি।

— ঠ্যাং ভেঙে দিতে হয়।

কিন্তু সব কথাই বেশ চাপা গলায়।

প্রতিটি লোকই যে ভীরু তাই নয় বেইমানও।

এই সব উসকানির প্রভাব ঠিকই পড়ল বাবার ওপর। ধুপ ধাপ করে নিচে নেমে গেল বাবা। বীরু জানলা দিয়ে মাথা বাড়িয়ে দেখছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সে জায়গাটা আরও গাঢ় অন্ধকার। দরজা খোলার শব্দ আর তারপরই চটাস চটাস আওয়াজ। বাবা মায়ের পা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে বোধ হয়। আরও দু'তিনজন জানলা দিয়ে মাথা বের করে দেখবার চেষ্টা করছে। মায়ের কান্নার শব্দ অন্ধকারের মধ্যে যেন মোটা মোটা রেখা টেনে উঠে আসছে ওপরে। বাবা চাপা গলায় শাসাচ্ছে, চুপ করে থাকতে বলছে। আওয়াজটা শুনতে লাগছে ঠিক সাপের হিসহিসানির মতো।

কয়েক মুহূর্ত ও যেন ভুলে গেল কোথায় দাঁড়িয়ে আছে। যেন কাণ্ডটা ওদের বাড়িতেই ঘটছে, আর আঘাতগুলোও পড়ছে ওরই নিজের পিঠে।

অন্ধকারের মধ্যে দুটো রাগী মানুষের প্রবল ঝটাপটি, ঠিক যেন দুটো কালো বেড়াল গরগর করতে করতে লড়াই করছে।

— চুপচাপ বাড়ি চলে যাও!

— যাব না!

— না গেলে এখানে খুন করে ফেলব।

— কর খুন। আজ তোমার মাথায় চড়ে তবে মরব!

মায়ের স্বর আর কান্নাভেজা নয় একটা বেপরোয়া রুক্ষতার আভাস মায়ের গলায়। মা এখন সামনাসামনি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। মাস্টার একদিন চাঁদবিবির গল্প বলেছিল। মায়ের এই রাগ চাঁদবিবির বাহাদুরির চেয়ে কম নাকি? মার খাচ্ছে, তবু এতটুকু নুয়ে পড়ছে না। বাবাটা যেন একটা রাক্ষস, পিটুনি শুরু করলে আর কোনও খেয়াল থাকে না। হে ভগবান, মাকে বাঁচিয়ে দাও তুমি!

— আরে, এই ছোঁড়া বীরু! যা যা নিচে গিয়ে মাকে ছাড়িয়ে নে। তোর বাবার কোনও হুঁশ নেই। একেবারে খুন করে ফেলবে যে।

হুঁঃ, তাহলে বীরুর মাকে তোমরা চেন না। এত সহজে মরবার পাত্রী মা নয়। মা তো চাঁদবিবির অবতার ... বীরু জানলা থেকে মাথা সরিয়ে নেয়। ঘরে এখন ও ছাড়া আর একটা মাত্র লোক। বাকি লোকগুলি কোথায় গিয়ে লুকিয়েছে কে জানে। হয়তো কেটে পড়েছে। এই লোকটার চেহারা বেশ ভয়ানক, একেবারে দৈত্যের মতো। বীরুর দিকে এমন ভাবে তাকাচ্ছে যেন সব দোষ ওরই। ও যদি চলে যায় তাহলে লোকটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে ফেলতে পারে। তারপর বাবা আর মা যদি সারারাত বাইরে কুস্তি লড়ে তো লড়ুক।

— এই, চল নিচে চল। আমাকেও তো বাড়ি ফিরতে হবে। দরজা বন্ধ করতে হবে। চল নিচে!

কিন্তু ওর ইচ্ছে নেই নিচে যাওয়ার।

— চল আমি আজ তোর হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়ব।

মা ওপরে এল কি করে? ওর মনে হল অন্ধকারে ওই দৈত্যের মতো লোকটা যেন মা হয়ে গেছে। একটা মা নিচে বাবার হাতে মার খাচ্ছে, আর একটা মা ওপরে ওকে পিটছে। ও চেষ্টা করছে গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে কিন্তু গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে কই!

— আমি সারা শহরে তোকে খুঁজে মরছি, বাইরে ক্ষেতের ধারে গিয়েও কত ডাকাডাকি করেছি, আর তুই এখানে মাতালগুলোর সঙ্গে বসে ফূর্তি করছিস? চল আজ বাড়ি! আমি কোথায় ভাবছি এই ছেলে বড় হয়ে ...আচ্ছা, তুই বাড়ি যাবি কি না?

বাবার ওপর যে রাগটা হয়েছে সেটা এখন মা ঝাড়ছে ওর ওপরে। নিজেরা লড়াই করবে আর মাঝখান থেকে মারা পড়বে ও।

— আমি তো বাবাকে ডাকতে এসেছিলাম মা।

— খুব জানি আমি। ডাকতে এসেছিলেন উনি! মাঝরাত পার হয়ে গেছে!

— মা আমার হাতে ...

— আজ তোর কি দশা করি তাই দেখ।

— দেখ বাপু, তোমরা এবার বাড়ি গিয়ে ঝগড়া কর। আমাকে জ্বালাচ্ছ কেন? আমারও বাড়ি ফিরতে হবে। যদি ...

— চুপ কর বলছি, না হলে এখনই এমন হল্লা করব যে তোমার ঐ যদি-টদি সব বেরিয়ে যাবে।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমার ওপর মেজাজ দেখাতে হবে না। তোমার বাড়ির কর্তাটি তোমাকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু আমাকে চোখ রাঙাও কেন? আমি কারও বাপের খাই না।

— আরে যা যা, ভাল লোকগুলোকে বিগড়ে দেওয়ার জন্যে বজ্জাতির আড্ডা খুলে রেখেছে, আবার মেজাজ দেখাচ্ছে!

মায়ের মনোযোগ এখন ওই বদখত লোকটার দিকে, তাই বীরু কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছে। মা'র যদি এখন ওর কথা মনে পড়ে যায় তাহলেই দফা শেষ। কিন্তু বাবা গেল কোথায়?

নিচে কোনও সাড়া শব্দ নেই। বাবা নিশ্চয়ই নালার মধ্যে কোথাও বেহুঁশ পড়ে আছে। মাস্টার একবার একটা মাতালের গল্প বলেছিল, তার মুখে নাকি কুকুরে পেচ্ছাপ করে দিয়েছিল। এখন অবশ্য কুকুররাও ঘুমিয়ে পড়েছে। ও আস্তে আস্তে মায়ের হাত ধরে সিঁড়ির দিকে টানতে থাকে। বাবা কোথায় পড়ে আছে সেটা নিচে গিয়ে দেখা দরকার।

মায়ের রাগ বোধ হয় একটু পড়ে আসছে।

গলিতে বাবা পড়ে আছে উপুড় হয়ে।

— মা, বাবাকে ওঠাতে ...

— পড়ে থাকতে দে। হুঁশ ফিরলে নিজেই বাড়ি যাবে।

— না মা।

— আমি বলছি, তুই বাড়ি চল চুপচাপ।

মায়ের নিষ্ঠুরতা দেখে ওর অবাক লাগছে। বাবা সারারাত ঠাণ্ডায় এই গলিতে এভাবে পড়ে থাকবে? না, তা হয় না। ও মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যায় বাবার কাছে, ডাকে — বাবা ওঠো!

— চল, মাদার ...। বাবার মুখে ঐ নোংরা গালাগাল শুনে ওর সব সহানুভূতি উড়ে গেল, ও আবার ছুটে চলে এল মায়ের কাছে।

— কি? বলিনি আমি তোকে? মা বলে।

ও মায়ের হাত ধরে টানতে থাকে অন্যদিকে। বাবা আবার ওঠার চেষ্টা করছে। মা বেশ কিছুক্ষণ সেইদিকে তাকিয়ে থাকে।

বাড়ি পৌঁছন পর্যন্ত মা ওর সঙ্গে আর কোনও কথাই বলে না। নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে পথ চলে।

— বীরু, তুই কোথায় গিয়েছিলি রে? দেউড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেবী প্রশ্ন করে।

— তোর মাথায়! খবরদার বলে দিচ্ছি, আমার ছেলের গায়ে হাত দিবি না তুই।

বীরু আন্দাজ করে, একটু আগেই নিশ্চয়ই মা আর দেবীর মধ্যে একটা ভাল রকম খিটমিটি হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ বাবা ওকে ও রকম একটা বিচ্ছিরি গালাগাল কেন দিল? ওই সব কথা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়ে বীরু। সারারাত ঘুমের মধ্যে কত কি বলে যায় বিড় বিড় করে।

নয়

লম্বা লম্বা দাঁতওয়ালি জলালপুরনী বসে আছে মায়ের কাছে। দাদী চলে যাওয়ার পর দুজনের আবার ভাব হয়ে গেছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ঝগড়াও হয়। এখন ভাবের পালা চলছে। জলালপুরনীর পাতলা শাড়ির নিচে পা দুটো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। বীরু দেখতে পারে না ওকে। আজকাল ও সারাক্ষণ মা'র কাছে দেবীর নিন্দে করে।

— দেখ বোন, মেয়ে তো সকলের ঘরেই রয়েছে। তোমার মেয়ে তো আমার মেয়ের মতোই, ওর সঙ্গে আমার তো কোনও শত্রুতা নেই, ঠিক কি না বল?

— ঠিকই তো বোন। যা বললে একেবারে ষোলআনা খাঁটি কথা।

— কিন্তু লোকের মুখ তুমি চাপা দেবে কি করে? বল, ঠিক বলিনি?

— তুমি একেবারে সত্যি কথাই বলছ।

— আমার পরামর্শ যদি শোন তো বলি, যত শিগগির পারো, যেমন হোক একটা পাত্তর জোগাড় করে মেয়েটার গতি করে ফেল। না হলে ব্যাপার অনেক দূর গড়াবে এই বলে রাখছি। তারপর মেয়ের ভাগ্য। আমি কি ভুল বলছি কিছু?

— কি মুশকিল, আমিও তো তাই চাইছি, কিন্তু পাত্র পাচ্ছি কোথায়?

— বোন, তুই বড় বেশি সোজা মানুষ। কি যে চলছে, তুই টের পাচ্ছিস নে। একবার পা ফসকালে আর দাঁড়াবার জায়গা থাকে না। চাদরে একবার দাগ লেগে গেলে আর কাউকে মুখ দেখাবার অবস্থা থাকবে না...

— বোন তুইই বল, আমি এখন কি করি? কেউ কি শোনে আমার কথা!

— বলছি তো, ওর একটা গতি করে ফ্যাল, না হলে মেয়ে তোর হাতের বাইরে চলে যাবে। ওর চাল-চলন মোটেই ভাল ঠেকছে না।

— কোথায় করব, কি করে করব? আত্মীয় কুটুম সবাই তো দূরে দূরে, কাউকে চিনি না, জানি না। ভেবে ভেবে তো চুল পেকে গেল বোন।

— কি আর বলব, পাঁচজনে যা সব বলছে, শুনলে তুই আঁতকে উঠবি বোন।

— সবই তো ঠিক বলছ, কিন্তু ...

— এত বড় সোমত্ত মেয়ে, সারাক্ষণ টো টো করে বেড়াচ্ছে, এমন ভাবে আর কত দিন চলবে। অন্তত বাড়ির মধ্যে থাকুক, কাজকর্ম করুক, নয়তো ...

— হায়রে কপাল! এই কথা বলে বলে তো গলা চিরে গেল আমার।

— ছেলেপিলে যত দিন বাপ-মাকে ভয় করে চলে ততদিন সব ঠিক থাকে। কিন্তু ভয়-ডর যদি একবার চলে যায় তখন তুমিই বা কে, আর আমিই বা কে? তাছাড়া বোন, কিছু মনে কোর না, তোমার মেয়ের লজ্জা-শরম একেবারে ঘুচে গেছে, ঠিক কিনা বল?

— ঠিক, ঠিক। তুমি মিথ্যে কেন বলতে যাবে?

— মেয়ে তোমার এত বেপরোয়া হয়েছে, ভগবানই জানেন ওর কি গতি হবে!

— সত্যি কথা বলেছ।

— এখন তোমার কাজ হল ওকে শাসনে রাখা। তা যদি না পারো তো মনে রেখো আমি বলেছিলুম ...

— কি করি বল তো? এত বকাবকি করি, ঝগড়া করি, গালাগাল দিই, মারধোরও করি, আর কি করতে পারি বল? ও মেয়ে এখন পাকা বাঁশ হয়ে গেছে যে কোনও কিছুতেই নোয়ানো যায় না। এত বড় হয়ে গেছে এখন, গায়ে হাত তুলতেও তো ভাল লাগে না। আমাকে মা বলে গণ্যি তো করেই না, ভাবে বুঝি ...

— একবার বদনাম রটে গেলে আর কিছু করা যাবে না। খুব খারাপ হবে সেটা, আমি তো বাপু এই বুঝি। দিনকাল যে কত খারাপ হয়ে গেছে সে তো জানোই! ও তো আর কচি খুকিটি নয়, সব বোঝে জানে।

— জানবে না কেন? ওকে কি আর কেউ শেখাতে পারে? ও নিজেই দশজনকে শিখিয়ে দেবে! আমার কথা কানে নিলে তো।

— সংসারে ভাল-মন্দ সব রকমের লোকই আছে।

— ঠিক কথা!

— বুড়ো ধাড়ি মেয়ে, উচিত তো বাড়িতে থাকা। তা নয়, সারাদিন পাড়ার লোকের বাড়ি বসে হা হা হি হি।

— ঘরে তো ওর মনই বসে না, আমি কি করব!

— আমারও মেয়ে আছে। আছে কি না? একটা নয়, পাঁচ-পাঁচটা। আমাকে না জিজ্ঞেস করে বাড়ির বাইরে একটা পা রাখুক দেখি! কারও দিকে চোখ তুলে চেয়ে দেখুক দেখি কত বড় বুকের পাটা! গলা তুলে কথা বলার সাহস আছে? জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলব না? 'হ্যাঁ' ছাড়া আর কোনও কথা ওরা মুখ দিয়ে বের করে না। যদি বলি, সারারাত এক পায়ে খাড়া থাক তো তাই থাকবে, মুখ দিয়ে একটা আওয়াজ বেরোবে না।

— বোন, তোমার কথাই আলাদা। তোমার সঙ্গে আমার কি আর তুলনা হয়? তোমার কর্তাটি কত ভাল মানুষ। বাড়ির কর্তাই হল আসল। সে যদি ভাল তো ছেলেমেয়েও ভাল। তা না হলে জীবন বিকোয় কানাকড়ির দামে। আমি তো এই জানি সার কথা।

— দোকানে কত রকম লোক আসে রুটি নিতে, এটা-ওটা কিনতে, আমার কোনও মেয়ের তাদের সামনে যাওয়ার সাহস হবে?

— সেই তো বলছি বোন, যার বাড়ির কর্তা ভাল সে সব বাধা পার হয়ে যায়, আর যার কর্তা খারাপ সে সবদিকে ডোবে।

— অন্য কথা বাদ দাও, আমি তো মেয়েদের এমন শাসনে রেখেছি বোন, যে সূয্যি ডুবলেই বাড়ির দোর দিয়ে দিই। তারপর কেউ এসে যতই কড়া নাড়ুক দরজা খুলবে না। কে এসেছে কে জানে, খুলতেই যদি হয় তো আমি খুলব। ওদের এটুকু সাহসও নেই যে জানতে চাইবে, কে কড়া নাড়ছে। বাইরে ওদের বাপ দাঁড়িয়ে থাকলেও খুলবে না।

— আহা, তোমার মতো এমন বাধ্য সন্তান যদি ভগবান সবাইকে দিতেন! আমার তো কপালই পোড়া।

— এই তো, আমার বিম্বোটার বয়স এখনও পাঁচ পেরোয়নি, আমি এখন থেকেই ওকে ছেলেদের সঙ্গে খেলতে মানা করে দিয়েছি।

— আমার ঘরের লোকটি যদি ভাল হত তাহলে আর কোনও চিন্তা করতে হত না গো।

— এই তো, সেদিন তোর বীরুর সঙ্গেই খেলছিল বিম্বো, দেখেই তক্ষুনি আমি বাড়ি নিয়ে গেলাম। বীরু বেচারা তো এমন ছেলে যে সাতটা মেয়ের মতো। তোর ছেলে তো আমারও ছেলে। কিন্তু বোন, কিছু মনে কোর না, আজকাল মায়ের পেটের ভাইকেও বিশ্বাস করা যায় না। ঠিক কি না বল?

— আমার তো যৌবনটাই বৃথা গেল, আমি একেবারে ফোঁপরা হয়ে গেছি, কেঁদে কেঁদে...

মা যেন ঠিক করে রেখেছে যেমন করে হোক কান্না শুরু করবেই। ইচ্ছে করে এমন সব কথা বলে বলে মেজাজ খারাপ করছে যাতে কান্না এসে যায়। কান্নাকাটিতে মা ছোট বাচ্চাদেরও হারিয়ে দিতে পারে। কথায় কথায় গলা ধরে আসে। বড়রাও যদি এই রকম করে তাহলে বাচ্চাদের কি দশা হবে? জলালপুরনী তো সেই একই ধুয়ো ধরে রেখেছে, কাজেই মা চোখের জল ফেলার সুযোগ পাচ্ছে না। মায়ের মুখ কাঁদো কাঁদো, কিন্তু চোখে জল আসছে না। চোখ যেন মুখের সঙ্গে বেইমানি করছে।

— মানো আর নাই মানো, আমি বলব তুমি তোমার মেয়েকে এখনই সামলাও, না হলে পরে হাত কামড়ে মরবে। সত্যি কথা বলছি কিনা বল?

— সবাই দেখছি, আমাকেই দুষছে, কিন্তু আমি কি করতে পারি? কেউ কি

শোনে আমার কথা? আমি তো...

— আমার মেয়েদের তো দেখছ, পাড়া বেড়ানোর অভ্যাসটাই নেই ওদের। মা মানা করলে মেয়ে তাকে চোখ রাঙাবে। তেমন মেয়েই নয় ওরা।

— হায় রে, আমার মেয়ে আমার সতীন গো সতীন। কি করব বল?

মায়ের নালিশে এবার বেশ একটা সুর এসে গেছে, ঠিক যেন কারও শোকে বিলাপ করছে। প্রত্যেকটা কথার শেষে আরও আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে, দু'হাত ওপরে তুলে কখনও নিজের কানে হাত দিচ্ছে, কখনও বা মাটিতে ঠেকাচ্ছে। দেখে শুনে হাসি পেয়ে যায় বীরুর।

— বোন, সময় মতো বিয়ে না হলে সে মেয়ে সতীনের চেয়েও ভয়ানক হয়। এখনও সময় আছে, পণ্ডিতরা বলে গেছেন ...

— ওগো, আমি সে সব জানি। আমাকে আর কি বলবে? কিন্তু করি কি? নিজের সন্তান অবাধ্য, ঘরের পুরুষমানুষটি কোনও খোঁজ খবরই করে না, আমি কি করব বল?

— সারাটা দিন ওই বেহায়া পারোর বাড়িতে বসে থাকে, তুই তো ওকে আটকাতেও পারিস নে। আমি হলে অমন মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতুম। সত্যি বলছি!

— হায়, হায় কি যে করি আমি?

— ইচ্ছে করলে তুই সবই করতে পারিস। অমন মেয়েকে তুই যদি মেরেও ফেলিস তাহলেও কেউ কিছু বলবে না। তোর নিজেরই তো মেয়ে, ঠিক কি না? যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি তো বল। আমি তো তোর কিসে ভাল হবে সেই কথা চিন্তা করেই বলছি। না হলে আমার আর দায় কিসের? তুই নিজেই তো জানিস, আমাকে তুই এমন এমন সব কথা শুনিয়েছিস যে অন্য কেউ হলে আর এ-জন্মে তোর সঙ্গে কথা বলত না, কোনও সম্পর্ক রাখত না — ঠিক কি না বল? কিন্তু তবু আমি তোকে আপন বোনের মতোই দেখি, ঠিক কি না?

— ও সব পুরনো কথা ভুলে যাও বোন।

— ভুলেই তো গেছি। তাই তো তোর কাছে এসে বসি। ওটা তো এমনি একটা কথার কথা বললুম। আমি তো বোন যাকে ত্যাগ করি, তার মরণ হলেও মুখ দেখি না। আমাকে তুই চিনিসনে, আমি খুব খারাপ।

বীরুর আবার খুব হাসি পেয়ে যায়। এ যেন নিজেই নিজের ঢাক পিটছে। জলালপুরণী নিজেই নিজেকে খারাপ বলছে! এর মধ্যে নিশ্চয়ই রহস্য আছে।

— বোন, তুমি এসব কি বলছ? তোমায় যা কিছু বলেছি তার জন্যে আমাকে মাফ করে দাও। কিন্তু তুমিও তো আমাকে কম কষ্ট দাওনি!

— নিজে কি কি বলেছিলি, কথাগুলো একটু মনে করে দেখ। গলির মাঝে দাঁড়িয়ে আমার ছেলেপিলেদের এমন সব গালাগাল দিয়েছিলি, আমার জায়গায়

অন্য কেউ হলে আর কোনও দিন মুখ দেখত না তোর।

— যাক গে যাক বোন, তুমিও তো কম দুর্গতি করনি আমার। এক সের আটার জন্যে সারা পাড়ার সামনে আমার মাথা হেঁট করেছ। আর গালাগালির কথা যদি বল, তোমার নিজের গালিগালাজের কথা কি মনে নেই? সে সব কথা মনে পড়লে এখনও আমার বুকটা যেন ফেটে যায়।

— যাকগে বোন, যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। ওসব কথা এখন চাপা দাও।

— পেটে মুখে আমার বাপু সব এক, এই তো আমার দোষ। মনের মধ্যে কোনও কথা লুকিয়ে রাখতে পারি না। লোক দেখানি খোসামোদ করা আমার আসে না। মনটা আমার সাদা, ছল চাতুরি জানি না! অন্যদের মতো যদি চালাকি করতে পারতাম তাহলে কি আর ভাবনা ছিল! হ্যাঁ, মুখটা আমার খারাপ বটে, মনটা কিন্তু খাঁটি সোনা।

— তোর মন যদি সোনা হয় তো আমার মনও সোনা। কিন্তু বোকা মেয়ে, মনটা তো কেউ দেখতে পায় না। নিজের মুখখানা তাই একটু সামলে রাখতে হয়। ও সব কথা এখন থাক। দোষ তোরও ছিল, আমারও ছিল। কিন্তু এখন দেখছিস তো, তোর বিপদের সময় আমি তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারিনি। আমার মনে হল, আহা, বোনটা মুশকিলে পড়েছে, কত দুঃখী, আমার কর্তব্য, ওকে একটু ভরসা দেওয়া, ওর খোঁজ-খবর নেওয়া ...

বীরুর সব গুলিয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তার স্রোত কিভাবে পালটে যাচ্ছে ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। দেবী কি এমন করেছে যে এরা দুজনে বসে বসে এত নিন্দে করছে? মা সত্যি বেশ বোকা, যে যা পারে উলটো পালটা বুঝিয়ে দেয়। মায়ের মাথায় একটুও বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। এখন দেবীকে ভুলে গিয়ে এরা দুজনে আবার অন্য এক কেচ্ছা নিয়ে বসেছে! আর কিছুক্ষণ যদি এই ভাবে কথাবার্তা চলতে থাকে তাহলে দুজনের মধ্যে আবার ঝগড়া লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বীরু এদের ঝগড়াকে বড় ভয় পায়, সারা পাড়ায় এদের ঝগড়ার রীতিমত নামডাক আছে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে যায়। বাচ্চারা খেলাধুলো থামিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, ঠিক যেন বাঁদর নাচ বা ভালুক নাচ দেখছে। আর তারপর ক'দিন ধরে পাড়ার গলিতে, স্কুলে সর্বত্র ছেলেরা বীরুর মায়ের ঝগড়া নকল করে দেখাতে থাকে। এক একটা ছেলে বীরুর মায়ের হাত নাড়া, দেহাতি, মেয়েলি বুলিতে চেঁচামেচি, ঝগড়া এমন নিখুঁত অভিনয় করে দেখায় যে বীরু পর্যন্ত সব ভুলে মুগ্ধ চোখে তামাশা দেখে। কিন্তু যখনই এ রকম ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে তখন বীরুর পক্ষে বাড়ি থেকে বেরোনই মুশকিল হয়। স্কুলে মাস্টারদের কানেও পৌঁছে যায় এসব খবর! তখন মাস্টারদের ভারি ফুর্তি। স্কুলের সমস্ত ছাত্র আর মাস্টার একদলে আর বেচারা বীরু একলা অন্য দলে।

এই সব কথা ভাবতে ভাবতে বীরুর মনে হয় ওর মাথার মধ্যে কেউ যেন

একগাদা ছোট ছোট কাঁকর ভরে দিয়েছে। না, না, না ! মাকে ও কিছুতেই আর ঝগড়া করতে দেবে না জলালপুরণীর সঙ্গে। জলালপুরণীর দাঁত যতই লম্বা হোক না কেন ...

বীরুর হঠাৎ মনে হল জলালপুরণীর দাঁতগুলো বড় বেশি লম্বা। ইচ্ছে করছে দাঁতগুলো ধরে টানতে টানতে জলালপুরণীকে রাস্তায় বের করে দিয়ে আসে। উটের মতো বেঢপ এবড়ো খেবড়ো জলালপুরণী তখন খুব কাঁদবে।

ও হেসে ফেলে। মা আর জলালপুরণীর কথা এখন ওর মন থেকে সরে গেছে। অনেকক্ষণ নিজের কি সব আবোলতাবোল চিন্তার গোলকধাঁধায় ঘুরপাক খায় বীরু। বাইরের কোনও কিছুই তখন দেখতে বা শুনতে পায় না। এই ভাবে নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়া, নিজের আশেপাশে একটা ক্ষণস্থায়ী কিন্তু দুর্ভেদ্য পাঁচিল তুলে দেওয়ার অভ্যাসটা ভাল না খারাপ কে জানে। কিন্তু এটাতে বীরুর ভারি উপকার হয়। এমনটা না করতে পারলে ও হয়তো পাগল হয়ে যেত।

— যা, দেবী হতচ্ছাড়িকে ডেকে নিয়ে আয়।

— ও গিয়ে ডাকলেই সে আসবে না কি?

— যা না, চুলের মুঠি ধরে টেনে আনবি।

জলালপুরণীর পরামর্শগুলো এখন থেকেই কাজে লাগাতে চেষ্টা করছে মা। জলালপুরণী নিচের ঠোঁটে আঙুল রেখে মুচকি মুচকি হাসছে। নিজের সাফল্যে বেশ খুশি খুশি ভাব। দেবীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনার কাজটা বীরুর বেশ ভালই লাগত। কিন্তু মুশকিল হল কি, দেবীটা বেজায় লম্বা হয়ে গেছে। দাঁড়িয়ে থাকলে বীরুর হাতই পৌঁছয় না দেবীর বিনুনিতে। তাছাড়া এখন ও রকম করতে একটু লজ্জাও করে। মায়ের আর কি? মা তো সব সময় উলটো পালটা বলেই খালাস।

— না মা। আমি ওসব পারব না।

— কি বললি?

— তুমি নিজে গিয়ে ডেকে আনো না।

— দেখছ তো বোন? ওটার দেখাদেখি এ হতভাগাও আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে।

— এ রকম তো হবেই। ও যেমনটি করবে...

জলালপুরণীর কথা সবটা না শুনেই ও উঠে দাঁড়ায়।

— যাচ্ছিস তো ওকে ডাকতে?

— না। একছুটে ও চলে যায় বাইরে রাস্তায়।

জলালপুরণী আর মা আবার ঠোঁটে ঠোঁট মিলিয়ে গল্প শুরু করেছে। বীরু রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ লক্ষ্য করে দুজনকে। গলিতে এখন লোকজন নেই। আবার পা টিপে টিপে ফিরে আসে দরজার কাছে। দুজনে এখনও কথাবার্তায় এতই মগ্ন যে টেরও পায় না বীরু আবার এসে বসেছে ওদের কাছে। এখন ওরা এত নিচু গলায় কথা বলছে যে বীরু কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। কখনও মা জলালপুরণীর মুখের

কাছে নিজের কানটা এগিয়ে আনছে, কখনও বা জলালপুরণীর কান এগিয়ে আসছে মায়ের মুখের কাছে। যেন একটা খেলা চলেছে। জলালপুরণীর হাত কেবলই যেন ঢেউ খেলিয়ে দুলে উঠছে। কথা শুনতে পাচ্ছে না তাই নিবিষ্ট চিত্তে বীরু দেখছে হাতের নড়াচড়া। মনে হচ্ছে, জলালপুরণীর হাত ওর মায়ের হাতের সঙ্গে কথা বলছে। কথাটা মনে আসতেই ও হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে চারখানা রাগী চোখের চাউনি আছড়ে পড়ল ওর ওপর। বীরুর মুখের হাসিটা পচা ফলের মতো খসে পড়ল মুখ থেকে। ঠোঁট দুটো কুঁকড়ে এসে ঢেকে ফেলল দাঁতগুলোকে।

— বীরু, তোমাকে কি বললাম আমি? একবারে কোনও কথা শুনতে শেখনি, না? যাবে কি না? যাও শিগগিরি যাও, দেবীকে ডেকে নিয়ে এস।

দরজার বাইরের চাতালে হোঁচট খেয়ে কোনমতে সামলে নিল বীরু। পায়ের বুড়ো আঙুলে চোট লেগেছে, ঠোঁট টিপে ব্যথাটা সহ্য করে জলালপুরণীর উদ্দেশ্যে একটা গালি দিয়ে এগিয়ে গেল পারোর বাড়ির দিকে।

গলিটা একেবারে নির্জন। পারোর বাড়ি গলির অন্য প্রান্তে। ঠোক্কর খেয়ে পায়ের আঙুলটা বেশ ব্যথা করছে। গলির মাঝামাঝি রোদ এসে পড়েছে, পা জ্বালা করছে। পারোর বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে কান্না পেয়ে গেল। দাঁত টিপে চোখের জল আটকে রাখতে চায়। গলায় যেন কি আটকে রয়েছে, জল তেষ্টা পাচ্ছে। চোখে জল, কিন্তু মুখটা যেমন তেমনই রেখে দেয়। মা যখন কাঁদে — মুখটা বিশ্রী লাগে, চোখ দুটো কুঁচকে ছোট্ট দেখায়, ঠোঁট কাঁপে, গলার স্বরটা এত বিকৃত হয় যে বীরুর বমি পায়। ওর তখন ইচ্ছে করে টেনেটুনে মা'র মুখখানা আবার সোজা করে দেয়।

পারোর বাড়ির দরজা বন্ধ।

বীরু ভাবতে থাকে, দেবীকে চেঁচিয়ে ডাকবে, না গিয়ে দরজা ধাক্কাবে। শুধু ডাকলে দেবী নিশ্চয়ই বেরিয়ে আসবে না। হয়তো শুনতেই পাবে না। গল্পে যখন মেতে থাকে তখন কারও ডাকাডাকি ওর কানেই পৌঁছায় না। ঘুমোচ্ছে কি না তাই বা কে জানে। তাহলে তো মাথার কাছে ঢাক পিটলেও ঘুম ভাঙবে না। মাঝে মাঝে ও ইচ্ছে করেই সাড়া দেয় না, চুপচাপ বসে থাকে। হঠাৎ দাদীর কথা মনে পড়ে বীরুর। দাদী বলত, তোর মা জেনেশুনে চুপ করে থাকে, যেন শুনতেই পায়নি। কে জানে, দাদী এখন কোথায় বসে আছে!

এই সব ভাবতে ভাবতে পারোদের দরজা ধাক্কা দেয়। একটু পরে দরজা খোলে, সামনে দাঁড়িয়ে পারো। ওর তিনগুণ লম্বা, মাথায় কাপড় নেই খালি পা, চুলগুলো উসকো খুসকো, মোটা দেহ ঘামে ভেজা, চোখ মিটমিট করছে আর বগল চুলকোচ্ছে।

— দেবী কোথায়? বীরু বেশ রুক্ষভাবে প্রশ্ন করে।

— কোন্ দেবী? পারো ক্ষ্যাপাচ্ছে ওকে।

— আমাদের দেবী, আবার কে? বীরুর এসব ঠাট্টা ভাল লাগে না।

— আমার পকেটে! পারো এবার নিজের জামার পকেট দেখায়।

— তাড়াতাড়ি বল, মা ডাকছে ওকে।

— বলছি তো আমার পকেটে, নিয়ে নাও না!

বীরুর মোটেই হাসি পায় না।

— ভেতরে এস না, বাইরে রোদে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

— আমি দেবীকে ডাকতে এসেছি।

— আচ্ছা আচ্ছা, ভেতরে এস, শরবৎ খাওয়াব।

— না, খাব না। দেবী কোথায়?

— আরে বাবা, বলছি তো, ভেতরে আমার জামার পকেটে পড়ে আছে, নেবে তো এস, দিচ্ছি!

কিন্তু ওর এবারও হাসি পেল না। দুজনে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে।

— বড় জেদি ছেলে তো! আসবে না? দরজা বন্ধ করে দিই? বল? বন্ধ করব? থাকবে রোদে দাঁড়িয়ে!

ও কোনও কথা বলে না।

— তিন পর্যন্ত গুনব। তার মধ্যে আসবে তো এস, না হলে দরজা বন্ধ করে দেব। তখন থেকে রোদে দাঁড়িয়ে। আমরা ভেতরে বসে মিষ্টি মিষ্টি লাল টুকটুকে সরবৎ ...

ওর শুকনো গলায় যেন কাঁটা ফুটছে। মুখ টিপে বন্ধ করে নিজের জায়গায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের তলায় জ্বালা করছে, আগুন জ্বলছে মাথার ওপর।

পারো ওর হাত ধরে টান মারে। ও হাত ছাড়িয়ে সরে যায়। পারো এবার হেসে ফেলে। ওর হাসিটা ভারি অদ্ভুত, ঠিক যেন খোকার ঝুমঝুমির বাজনা।

— আমাদের খোকাও ভেতরে আছে?

— ওটা তো আমাদের খোকা। ভেতরেই আছে, ওকে আলমারিতে বন্ধ করে রেখেছি।

কি যে বাচ্চাদের মতো কথা বলে। আমি কি এখনও কচি বাচ্চা? যা বলবে তাই বিশ্বাস করব? দৃষ্টির মধ্যে এই সব কথাগুলো মিশিয়ে দিয়ে পারোর দিকে তাকাল বীরু। পারো যেন বুঝল ওর কথা। একটু মনোযোগ দিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে করতে গম্ভীরভাবে বলল, আসতে হয় তো এস। দেবী এখানেই আছে, খোকাও আছে।

— দেবীকে মা ডাকছে।

— ডাকুক গে। মা'র আর কি কাজ? সব সময়ই তো ডাকছে। তুই একটু আয় না ভেতরে।

— না, দেবীকে পাঠিয়ে দাও। বীরু মাটিতে পা রাখতে পারছে না, লাফাচ্ছে।

— ঠিক আছে ভাই, পাঠিয়ে দিচ্ছি। দেবীকে নিয়ে তো আমি আচার বানাব না। কিন্তু একটু ভেতরে আয় না, আমিও তো তোর বোন হই? খোকা এখুনি

ঘুমিয়েছে, ওর ঘুম ভাঙলে নিয়ে যাস। এখন আয়।

পারো কেমন মিষ্টি করে কথা বলে। পারো যদি আমার মা হত। মা যদি এই রকম করে কথা বলত তাহলে কি ভালই না হত। এই জন্যই দেবী এখানে বসে থাকে। জলালপুরণী কেবল যত বাজে কথা বলে।

পারোর সঙ্গে ও ভেতরে চলে আসে। ভেতরে দেবী খোকাকে নিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমোচ্ছে, চোখ বন্ধ, ঠোঁট ফাঁক হয়ে রয়েছে। কিন্তু হাতে একখানা হাতপাখা, যেন নিজে নিজেই নড়ছে। ঘরের মধ্যেটা বেশ ঠাণ্ডা।

দেবীকে ডাকবার জন্যে ও মুখ খুলতেই পারো ওর মুখে হাত চাপা দেয়। পারোর হাতের ঘামের গন্ধটা বেশ লাগে। ও পারোর সঙ্গে পাশের ঘরে যায়। সেখানে মেঝেতে শুয়ে আছে পারোর মা, তারও চোখ বোজা। বীরুর আবার মনে পড়ে যায় দাদীকে। পারোর মা এত বুড়ি কেন? নিজের পেটের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলোচ্ছে, ঠিক যেন ছোট বাচ্চাকে ঘুম পাড়াচ্ছে।

— মা, এই দেখ কে এসেছে।

— কে রে? বীরু? এস বাবা এস, তুমি তো আসই না আমাদের বাড়ি। দেবী এসেছে তাই ডাকতে এসেছ।

পারোর মা কিছুক্ষণ এসব কথাবার্তা বলতে থাকে, হাসি-ঠাট্টা করে। মুখে একটাও দাঁত নেই তাই তার হাসিটা বেশ মজার দেখায়। দাদীর কথা আবার মনে পড়ে যায়। দাদীরও যদি একটু হাসবার অভ্যেস থাকত... খোকাও ঠিক এই রকমই হাসে। মা মাঝে মাঝে বলে ওঠে, ও আগের জন্মের কথা মনে করে হাসছে।

— বীরু বোস, কি খাবি বল?

— কিছু না।

— ও আবার কি কথা? বরফি খাবি?

— না।

— তবে পেড়া খাবি?

— না।

— আচ্ছা, একটু এদিকে আয় তো দেখি।

— দেবী ... দেবী! ... দেবী ... !

— ওরে, অত চেঁচাস না।

— দেবী, বাড়ি চল, মা ডাকছে।

— কি করব কি বাড়ি গিয়ে?

দেবীর এই প্রশ্নে এত বিরক্তি যে বীরু চুপ করে যায়। ও নিজেও নিজেকে এই প্রশ্নই করে। ও যেন নিজের বয়সের সীমা পেরিয়ে এমন কোনও চিন্তায় ডুব দিয়েছে যে এখন ওকে দেখলে ওর বয়সটা আন্দাজ করাই মুশকিল। অল্পক্ষণ সকলেই চুপ করে থাকে। বীরুর মাথা নিচু, যেন ও হার স্বীকার করে নিচ্ছে। পারো

এগিয়ে এসে দু'হাত দিয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। বীরুর চোখ দুটি চমকে ওঠে বিস্ময়ে, কিন্তু ওর গলা এখন পরিষ্কার। কান্নাও তাহলে দু'রকমের হয়। চোখের জল কখনও কটু, কখনও মিষ্টিও। কান্না মিষ্টি হলে চোখ জ্বালা করে না, বরং নির্মল হয়ে ধুয়ে যায়। বীরু যদি কটু আর মিঠে কান্নার প্রভেদটা ধরতে পারত তবে এই মিষ্টি চোখের জলে ওর মনের অনেক তেতো দাগ মুছে যেতে পারত।

— মায়ের কাছে কে বসে আছে রে বীরু?

— জলালপুরণী।

— আমি তোকে বলেছিলাম না পারো! এখন বাড়ি ফিরে আমার যা দশা হবে সে আমিই জানি।

— কি হয়েছে? অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন?

দেবী ভয় পাচ্ছে বাড়ি যেতে! পারো ওকে সাহস জোগাচ্ছে। মা ঠিকই বলে, পারো দেবীকে উলটো রাস্তায় চালায়। কিন্তু পারো যে এক্ষুনি ওকে চুমো খেল? ও পারোর দিকে চেয়ে থাকে। মা একদম ভুল বলে, পারো খুব ভাল। কেন ভাল তা ও জানে না। কিন্তু এখন থেকে ও সব সময় পারোর দিকে হয়ে কথা বলবে। পারো ওকে চুমো খেয়েছে।

পারো হঠাৎ, কে জানে কেন, খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসির রেশ যেন বাসনের ঝনঝনানির মতো এদিক ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে আস্তে আস্তে থেমে যায়। ঠিক যেন অন্ধকারে জোনাকির ঝিকিমিকি। দেবী বিমর্ষ মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

— চল ও ঘরে যাই, খোকা উঠে পড়েছে।

পারোর মা এমন ভাবে মেঝেতে শুয়ে, যেন একটা জিনিস মাটিতে পড়ে গেছে আর সেটা তোলার কারও কোনও ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। কিন্তু তার এই ভাবে শুয়ে থাকাটা একটুও খারাপ লাগছে না। দেবী আর পারো পাশের ঘরে চলে গেছে। বীরু আরও কিছুক্ষণ এ ঘরে পারোর মায়ের দিকে চেয়ে থাকে।

খোকার ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘরখানাও জেগে উঠেছে। খোকাকে মেঝেতে বসিয়ে পারো তার সামনে ছড়িয়ে দিয়েছে দুটো ছোট ছোট তালা, একটা খালি পালিশের কৌটো, একটা ছোট চিরুনি, একটা চাবির গোছা, এক টুকরো দড়ি আরও খুচখাচ সব জিনিস। খোকা মন দিয়ে সব দেখছে। এখনও ভাল করে বসতেই শেখেনি। মাঝে মাঝে টলে পড়ে যায়। তখন সবাই ছুটে আসে। কিন্তু ও নিজেই ঠিক সামলে নেয়, যেন ইচ্ছে করেই সবাইকে ঠকিয়েছে।

পারো ধুপ করে বসে পড়ে খোকার পাশে, ওকে নিয়ে খেলা শুরু করে। দেবী আর বীরু দুজনে দুজনের দিকে তাকায়। দেবীর মুখ এখনও ভার। পারো খোকার সামনে ঝুঁকে পড়েছে, ওর ডানদিকের গালটা প্রায় মেঝেতে ঠেকছে। হাঁটুটা উঁচু হয়ে আছে। পারো কত রকম শব্দ করে খোকাকে হাসাবার চেষ্টা করে।

বীরু আবার তাকায় দেবীর দিকে, যেন ওকে অনুরোধ করছে বাড়ি ফেরার জন্যে। তারপর পারোর পাশে বসে খোকাকে হাসাবার জন্যে পারোর উরুতে থাবড়াতে থাকে। পারো ওর গালে আস্তে করে চাপড় মেরে বলে—ওরে ভাই, আস্তে মার, আমার পা-টা তো আর পাথর নয়। বীরুর খুব মজা লাগছে। দেবী ওদের তিনজনের সামনে দাঁড়িয়ে চুপচাপ দেখছে সব। বীরুও মাঝে মাঝে তাকায় দেবীর দিকে, বুঝতে চেষ্টা করে দেবী ওকে বসে থাকার অনুমতি দিচ্ছে, না বাড়ি যেতে বলছে।

— আচ্ছা পারো আমি এখন চলি।

— সন্ধ্যেবেলা আবার আসিস।

— দেখি।

— দেখি-টেখি নয়, চলে আসবি। বাকি কথা পরে হবে।

খোকাকে তুলে নিয়ে দেবী এগোয় দরজার দিকে। বীরু পারোর দিকে তাকায়। যেন জানতে চাইছে, আমিও চলে যাব? পারো উঠে দাঁড়ায়। বীরু বোঝে, ওকেও যেতেই বলা হচ্ছে। ও আরও কিছুক্ষণ বসে বসে পারোর উরু থাবড়াতে চায় ...।

দেবী দরজা খোলার জন্যে হাত বাড়িয়েছে এমন সময় বাইরে মায়ের গলা শোনা গেল — দরজা খোল!

মাকে দেখেই দেবী দু'পা পিছিয়ে গেল। মা সদাই ঠিক সময় বুঝে হাজির হয়। বীরু লুকোতে চেষ্টা করে পারোর পিছনে।

— এস মসি! পারো হেসে বলে।

মা এক হ্যাঁচকায় ছিনিয়ে নেয় খোকাকে। খোকা কান্না জুড়ে দেয়, মা তাকেও গালি দিয়ে ওঠে। তারপর একলাফে বীরুর হাত ধরে টানতে থাকে বাইরের দিকে।

— তোকে এখানে কেন পাঠিয়েছিলাম শুনি?

ও চুপ করে থাকে। দেবীও ওদের সঙ্গে চলেছে। পারো ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। মায়ের কাপড়ে কি দুর্গন্ধ। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে বীরু ভাবে ওর নিজের গায়েও কি তাহলে অমন দুর্গন্ধ? কেউ যেন ওকে নাওয়া-ধোওয়ার পর আবার হপ্তাখানেকের না-কাচা বাসি জামাকাপড় পরিয়ে দিয়েছে।

দশ

কান খুলে মন দিয়ে শুনে নাও! রোজ রোজ একঘেয়ে বকর বকর শুনতে শুনতে আমার একেবারে বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। নিজের চালচলন যদি না বদলাতে পারো, আমি এবার সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব, বুঝলে! তারপর সারাজীবন বসে বসে কেঁদো, বুঝলে তো বড়মানুষের মেয়ে!

মা নিজের বাপ-মায়ের বিরুদ্ধে একটা কথাও সহ্য করতে পারে না, চিড়বিড়িয়ে রেগে উঠে বলে, 'খবরদার, আমার বাপ মা তুলবে না বলে দিচ্ছি।' আর তারপর বাবা শুধু মায়ের বাপ-মা কেন, তাদেরও বাবা-মা এবং তাদেরও বাপ-মাকে গালাগালের আওতায় এনে ফেলে এমন সব কথা বলে যেন মায়ের সব কিছু দোষের জন্যে সেই সব পূর্বপুরষরাই দায়ী।

কিন্তু এখন মা চুপ করে আছে। মেঝেতে উপুড় হয়ে ফোঁপাচ্ছে। চুলগুলো পাকিয়ে দড়ির মতো হয়ে গেছে। বাবা চুলের গোছা ধরে পাকিয়ে পাকিয়ে এত জোরে টেনেছে যে মা আর্তনাদ করে উঠেছিল। সেই সময় বাবা চুলের গোছাটা ছেড়ে না দিলে চুলগুলো উপড়ে চলে আসত বাবার হাতে, মায়ের মাথা থেকে রক্তের ফোয়ারা বইত। কথাটা ভেবেই বীরুর সারা গা শিউরে উঠেছিল। দেবী চেষ্টা করেছিল বাবাকে টেনে সরাতে, কিন্তু রাগলে বাবা যেন লোহার মতো শক্ত হয়ে যায়।

বীরু মায়ের কাছে শুনেছে, বাবা নাকি জোয়ান বয়সে রামলীলায় কখনও রাবণ, কখনও অঙ্গদ সাজত।

মায়ের দড়ির মতো পাকানো চুল এবার খুলে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে যেন প্রাণ পাচ্ছে চুলগুলো।

আজ ভোরবেলাতেই কে জানে কেন এই যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। রাত্রে বাবা অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরেছে। বাবার আশায় বসে বসে ও রান্নাঘরেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমোবার আগে মা ওকে অনেক গল্প বলেছিল বলেই বোধ হয় তাড়াতাড়ি ঘুম এসে গেল।

মা বলেছিল, বাবা নাকি একবার মাকে বাজি রেখেছিল জুয়ায়। তখন ওরা কীরাঁওয়ালা নামে একটা ছোট গ্রামে থাকত। দেবী তখন খুব ছোট। সবাই খুব ভালবাসত দেবীকে। আমার তখনও জন্মই হয়নি, বোধ হয় শিগগিরই জন্মাব। দেবীকে সেখানকার লোকেরা একটা নাম দিয়েছিল। দেবী তখনও বেড়াতে খুব ভালবাসত। অবশ্য ছোটবেলায় তো সবাই বেড়াতে ভালবাসে। কিন্তু বড় হয়েও ছোটবেলার অভ্যেসগুলো থেকে গেলে তো খুব মুশকিল! দেবীর সেই নামটা মায়ের এখন আর মনে নেই, অনেকক্ষণ কপাল টিপে, মাথা চুলকে কিছুতেই মনে করতে পারল না মা।

— কি করব। আমার মাথায় কি আর আছে কিছু? যখন ছোট ছিলাম, আমার চাচা বলত — জানকী, তোর মগজে এত বুদ্ধি এল কি করে? তোর মা তো এক নম্বরের বোকা।

তারপর অনেকক্ষণ মা নিজের বাপের বাড়ির খুঁটিনাটি গল্প শুনিয়েছিল। বীরুরও খুব ভাল লাগছিল সেই সব গল্প শুনতে, ঘুম ছেড়ে গিয়েছিল কিছুক্ষণ।

কিন্তু একটু পরেই মা আবার ওই সবআজে বাজে কথা বলতে শুরু করল — একবার, বুঝলি বেটা, এ তো আমাকে বাজি রেখে বসল। এখন সে সব কথা মনে পড়লে হাসি পায়। পাণ্ডবরাও তো দ্রৌপদীকে বাজিতে হেরেছিল। কিন্তু সে সব তো ভগবানের লীলা! আর এই সব হচ্ছে সেই বেইমান রামচরণের কেরামতি। রামচরণ ছিল বাবার বন্ধু, সারাদিন তার সঙ্গেই যত ঘোরাফেরা, যা রোজগার করত সব উড়িয়ে দিত মদে। জুয়োও চলত। তখন বাবার উপরি রোজগার ছিল অনেক। সে জায়গাটা ভাল ছিল, কিন্তু তা হলেও মাঝে মাঝে এমন দিন গেছে যেদিন বাড়িতে উনুন জ্বলেনি।

— একদিন যখন হাতে যা ছিল সব হেরে উঠে পড়ছে, তখন ওই বেইমান রামচরণটা বলে বসল, আর এক হাত খেলে দেখাই যাক। তোর বৌকে বাজি রাখ না? সে নিশ্চয় ঠাট্টা করে বলেছিল — কিন্তু এর তো তখন নেশার ঘোরে হুঁশ নেই। এ সেই কথাই মেনে নিল। তারপর কি কাণ্ড! পরের দিন সারা গ্রামে ছড়িয়ে গেল কথাটা। বাচ্চা ছেলেগুলো পর্যন্ত জেনে গেল। সে সব যে কি লজ্জার কথা তা আর কি বলব তোকে! কত কি যে দেখতে হয়েছে! আমাকে যা দেখতে হয়েছে ঈশ্বর যেন সে সব আর কাউকে না দেখান। আমি যা সহ্য করেছি, অন্য কেউ তা সয়ে দেখাক তো একবার! সে সময় তোর দাদী আমাদের কাছে থাকত না।

এরপর মায়ের কথার স্রোত আবার কে জানে কোন্ দিকে ঘুরে গেল। অচেনা শহরে এক নতুন পথিক যেমন দিশাহীন ঘুরে বেড়ায়। মায়ের কথার স্রোতও তেমনই ঠিক জায়গায় পৌঁছতে গিয়ে কত যে এলোমেলো ঘুরে বেড়াবে তার ঠিক ঠিকানা নেই।

এক সময়ে মায়ের দুঃখের কথা শুনতে শুনতে বীরুর চোখের পাতা ভিজে উঠত। কিন্তু আজকাল ওই সব শুনলে ওর ঘুম পায়।

দাদীর নিন্দে শুনতে বীরুর কোনও দিনই ভাল লাগে না। তাছাড়া দাদীর সমালোচনা করতে গিয়ে মায়ের গলায় আর ভাষায় এমন তেজ এল যে বীরু বেশ বুঝল কোনও প্রতিবাদ না করে চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়াই শ্রেয়। কানের ওপর হাত চাপা দিয়েছিল যাতে মায়ের কথাগুলো শুনতে না হয়। মা আবার মাঝে মাঝে জেনে নিচ্ছিল — শুনছিস তো? কি রে, ঘুমিয়ে পড়িসনি তো? একবার ও বলে ফেলেছিল, না ঘুমিয়ে পড়েছি। মা শুনে কিন্তু রেগে যায়নি, বরং ঝুঁকে পড়ে চুমু খেয়েছিল।

দিনের বেলায় মায়ের ভাবগতিক এক রকম থাকে, আর রাত্রিবেলা অন্য রকম। বীরুর ইচ্ছেমতো যদি কিছু হত তাহলে বীরু চাইত ওদের বাড়িতে সব সময় রাতই থাকুক। বাবা যেন বাড়িতে না থাকে। জলালপুরণীকে কোথাও দেখা না যায়। আর দেবী যেন খুব ঘুমিয়ে থাকে। মা তখন কেবল এই রকম বসে বসে গল্প বলবে; শুনতে শুনতে ও মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়বে আবার একটু পরেই জেগে উঠবে। আর যখন ও জেগে উঠবে তখন মা যেন এই রকম মেঝেতে উপুড় হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে না কাঁদে।

মা এখনও মেঝেতে পড়ে আছে উপুড় হয়ে, তবে ফোঁপানিটা বোধ হয় থেমেছে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে উঠছে সারা দেহ। মায়ের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বাবা এখন মাকে দেখছে। আস্তে আস্তে মাথা তোলে মা, মুখখানা দেখে বীরুর ভয় করে। মা উঠে বসার পর বাবা হাত ধরে টেনে মাকে দাঁড় করায়, তারপর আরও দু'একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছেড়ে দিল। পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নেয় মা। গজগজ করতে করতে বাবা বাইরে চলে যায়। মা কাঁদতে থাকে ডুকরে ডুকরে।

— মা, চুপ কর, বীরু বলে মায়ের কাছে এসে।

— চুপ কর মা, দেবীও বলে।

মা উঠে দেওয়ালে মাথা ঠুকতে থাকে। ওরা দুজনে মাকে ধরে ফেলে। মা যেন পাগল হয়ে গেছে। দেউড়ির দরজাটা খোলা। বীরুর দুজন বন্ধু দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছে। স্কুলের সময় হয়ে গেছে, তাই ওরা ডাকতে এসেছে।

— বীরু, স্কুলে যাবি না?

বীরুর কানে পৌঁছয় না ওদের ডাক। মায়ের সঙ্গে ও-ও আস্তে আস্তে কাঁদছে। মা যেদিকে ঢলে পড়ছে, ও সেদিকে হেলছে। ওদের দুজনকে সামলাতে গিয়ে দেবীও হেলে পড়ছে।

দরজায় দাঁড়ানো ছেলে দুটো হেসে উঠল বেশ জোরে।

বীরু এবার মায়ের আঁচল ছেড়ে ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ছেলে দুটো হাসি থামায়। বীরুর ঠোঁট কাঁপছে রাগে, লজ্জায়।

— আজ স্কুলে যাবি না বীরু? দেরি হয়ে যাচ্ছে যে।

বীরু ওদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। মা গিয়ে শুয়ে পড়েছে চারপাইতে। দু'হাত ওপরে তুলে বলছে — উঃ মরণ হয় না কেন আমার।

ছেলে দুটো নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করছে। বীরুর মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে এখন, কিন্তু ওর ঠোঁট আর কাঁপছে না। ওর চোখের জল বুঝি আগুন হয়ে গেছে।

— একটু দাঁড়া, আমি এখনই আসছি।

বীরু ছুটে ভেতরে গিয়ে মুখটা একটা কাপড়ে মুছে স্কুলের ব্যাগ তুলে বেরিয়ে আসে।

— ও দেবী, বেচারাকে একটু কিছু খেতে দিবি তো?

বীরু ততক্ষণে বাইরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

— আরে ইয়ার, অত ছুটছ কেন? আমরাও তো যাচ্ছি।

— তোর মায়ের কি হয়েছে রে বীরু?

— তোর বাবাকে আমরা দেখলাম, খুব জোরে জোরে কোথায় যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছিল রে? মুখটা একেবারে লাল টকটকে, কি হয়েছে বল তো?

— আমরা তো কতক্ষণ ধরে তোকে ডাকছি।

— তোর বাবা দরজা খুলতেই আমরা তো ভয়ের চোটে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছি। তোর বাবাকে দেখে তোর ভয় করে না বীরু?

— আমাদের দেখতে পেলে আর রক্ষা ছিল না।

— কেন? প্রশ্ন করে বীরু।

ছেলেগুলো কোনও উত্তর দিতে পারে না। তিনজনেই চুপচাপ হাঁটে।

— বীরু, তোর স্কুলের কাজ করেছিস?

— না।

— কেন?

বীরু চুপ করে থাকে।

— হ্যাঁ রে বীরু, তোদের বাড়ি রোজ রোজ কেন ঝগড়া হয় বল তো?

— আমি বলব? বীরুর বাবা খুব কড়া লোক।

— আমার মা বলে, সব দোষ বীরুর মায়ের।

— আমার মা বলে, দোষ দুজনেরই।

— বীরু বেচারার আজ খাওয়াও হয়নি।

— ওর বোধ হয় খুব খিদে পেয়েছে।

— আমার মা বলে, বীরুর বোন দেবীও বীরুর মাকে খুব জ্বালাতন করে।

— আমার মা বলে, বীরুর মা খুব ঝগড়াটে।

— বীরু, তোর বাবা তোর মাকে মারে বুঝি?

— আরে ইয়ার, এই সব কথা কি জিজ্ঞাসা করতে হয় নাকি?

— বীরু, তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলবি না বুঝি?

— ছেড়ে দে না ভাই, ও বেচারার কান্না পাচ্ছে।

— বীরু বল না ভাই, কি নিয়ে ...

— কানা না কি? কোন্ হারামির কান্না পাচ্ছে?

— দেখ কথা বলিয়ে তবে ছেড়েছি।

— আচ্ছা বীরু, এবার বল তাহলে তোর মা কেন কাঁদছিল?

— আজ শালা জেনে তবে ছাড়ব!

— কেন? তোদের মায়েরা কাঁদে না কখনও?

— হ্যাঁ কাঁদে, তবে কখনও-সখনও। আর যদি কাঁদে তো আমরা সবাই মিলে চুপ করাতে চেষ্টা করি।

— কিন্তু বীরুর মা তো হামেশাই কাঁদে।

— আচ্ছা থাম এবার। ও বেচারার লজ্জা করছে।

— ঠিক আছে বাবা থামছি, কিন্তু এ হারামি তো আর কোনও কথাও বলছে না। এমন ভাবে হাঁটছে যেন ওর নানী মরেছে।

এই ছেলে দুটো এত জ্বালাতন করছে যে বীরুর শক্তি থাকলে সে ওদের ওপর ঝাঁপিয়েই পড়ত। কিন্তু এখন ওর এমন অবস্থা ভাল করে হাঁটতেও পারছে না। সারাদিন না খেয়ে থাকতে হবে ভাবলেই ওর মাথা ঘুরে উঠছে।

গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে পড়ে বীরু ছেলেগুলোকে বলে, এই কেশব, কাউকে কিছু বলবি না বলে দিচ্ছি। যদি বলিস তো আজ থেকে তোদের সঙ্গে আমার একেবারে আড়ি!

— কি বলব না?

— আমি বলছি, কিছুই বলবি না।

— কি বলব না?

— আরে ইয়ার, ওই যে ওর মা কাঁদছিল, সেই কথা।

— বলবই তো, সবাইকে বলে দেব। মাস্টারকেও বলব। বোর্ডে লিখে দেব। কেন বলব না শুনি? কেন বলব না?

— ঠিক আছে, বলে দেখ একবার।

— যা যা, দেখব 'খন।

ছেলে দুটো এগিয়ে যায় স্কুলের ফটকের দিকে। এই পাজি দুটো যদি রাষ্ট্র করে বেড়ায় তো সমস্ত ছেলে আজ সারাদিন আমার পিছনে লাগবে। কেশবটা হয়তো বলবে না, কিন্তু জীতাটা নিশ্চয় বলে দেবে।

— আচ্ছা, একটা শর্তে যদি রাজি থাকিস তো বলব না, জীতা কাছে এসে বীরুর কানে কানে কিছু বলে, তারপর আবার কেশবের কাছে চলে যায়।

দুজনে মিলে হাসতে হাসতে ঢুকে যায় ভেতরে। বীরু ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবে স্কুলে ঢুকবে কি না।

বড় ঘন্টার কাছে দাঁড়িয়ে চার পাঁচজন ছেলে পালা করে ঘন্টা বাজাচ্ছে। বীরুর পালা যখন এল ততক্ষণে প্রার্থনার ঘন্টা বেজে গেছে। বীরু তাড়াতাড়ি একবার ঘন্টাটা বাজিয়ে দিয়ে নিজের লাইনে গিয়ে দাঁড়ায়।

"তারীফ উস্ খুদা কী জিস্‌নে জহাঁ বনায়া"—

বীরু কিন্তু ঈশ্বরের এই বন্দনায় যোগ দিতে পারে না। চুপচাপ মাথা নিচু করে আপন মনে কি সব চিন্তা করতে থাকে। ঘন্টাটা আজ ও ঠিকমত বাজাতে পারেনি। মাস্টার আজ আবার সকলের বই দেখতে চাইবে। ও মাকে বলেওছিল যে আজ বই দেখাতে না পারলে মাস্টার মারবে। মা জবাব দিল, মারুক তো দেখি একবার। মা নিজেকে যে কি মনে করে কে জানে! অতই যদি বাহাদুর তাহলে আর...। মাস্টার ঠিক বলবে, বই-টই না নিয়ে আড্ডা মারতে এসেছেন এখানে, লাটসাহেবের ব্যাটা! কি পড়বে কি, মায়ের মুণ্ডু? কালও বই আনতে না পারলে মাস্টার এমন কান মুলবে যে চোখে একেবারে সরষে ফুল দেখতে হবে।

— যা না, অনাথ আশ্রমে গিয়ে থাক। তোর বাপের তো মদের পয়সা জোটে, জুয়োখেলার পয়সা জোটে, শুধু বই কেনার বেলায় পয়সা থাকে না, তাই না?

এরপর আদেশ হবে, যাও ওই কোণে গিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাক। এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বড় সোজা ব্যাপার নয়। মাস্টারকে যদি দাঁড়াতে হত তো ঠ্যালা বুঝত!

প্রার্থনা শেষ হল, এবার এক মিনিট মৌনতা।

বীরু জোড় হাতে চোখ বুজে মনে মনে বলছে, 'হে ঠাকুর, মাস্টার যেন আজ বইয়ের কথা না জিজ্ঞেস করে। ঠাকুর, আমাকে একটা পাখি বানিয়ে মাস্টারের মাথার টাকে বসিয়ে দাও!'

আবার একটা ঘন্টা বাজে। এবার লাইনগুলো নড়তে শুরু করে। বীরুর পিছনের ছেলেটা সমানে ওকে জ্বালাতন করছে, ওর জামা ধরে টানছে আর চুপি চুপি বলছে, এই বীরু, তোর প্যান্টের পেছনটা ছেঁড়া।

মাস্টার ক্লাসে ঢুকলেন কুঁচকি চুলকোতে চুলকোতে। ছেলেরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানাল — মাস্টারজি বন্দ্‌গী!

— আর একবার, বেশ গলা খুলে বল।

— মাস্টারজি বন্দ্‌গী। সারা ক্লাস একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে।

মাস্টারজি সব সময়, কে জানে কেন, কুঁচকি চুলকোতে থাকে। চুলকোতে চুলকোতে অন্যমনস্ক হয়ে গেলে অনেক সময় লুঙ্গির সামনেটা ফাঁক হয়ে যায়।

ছেলেরা হাসি চাপতে গিয়ে অদ্ভুত রকম শব্দ করে ফেলে। কিন্তু মাস্টারও আজব লোক। চুলকানোর কাজে তিনি এমনই মগ্ন যে বহুক্ষণ আশেপাশের কোনও কিছুতেই তাঁর হুঁশ থাকে না।

তারপর হুঁশ ফিরলে বলে ওঠেন, ওরে, কেউ গিয়ে দেখে আয়, এখনও হুঁকোটা আনছে না কেন! এত দেরি করে হতচ্ছাড়ি!

এই হতচ্ছাড়ি হচ্ছে মাস্টারের স্ত্রী!

দু-তিনটে ছেলে একলাফে দরজার দিকে এগোয়, বীরুও আছে তাদের মধ্যে। মাস্টার বীরুর কাঁধ চেপে ধরে বলে ওঠে, তুমি যাচ্ছ কোথায়?

বীরু তোতলাতে থাকে — আপনার হুঁকোটা আনতে ...

— বসে পড়। হুঁকো আনতে যাচ্ছেন! এই সেদিনের ছেলে, এরই মধ্যে হুঁকোর খোঁজে চলেছে! তোর বাপেরও ওই হুঁকো আনবার যোগ্যতা নেই। হারামখোরগুলোর কিছু একটা ছুতো চাই, বাস, বেরিয়ে পড়বে টো টো করে ঘুরতে। বসে থাক নিজের জায়গায়।

কিন্তু ও বসে কি করে? ঘাড়টা এখনও মাস্টারের কব্জায়। মাস্টার বোধ হয় ভুলেই গেছে। অন্যদিকে তাকিয়ে কি যেন দেখছে, অন্য কিছু ভাবছে, এদিকে কথা বলছে বীরুর সঙ্গে।

— এই হারামিগুলো, আমার সব জানা আছে বুঝলি? আমাকে ভোলানো সহজ নয়, তোদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। তোদের মতো এমন আমি হাজার, লক্ষ ছেলে চরালাম আর আমাকেই ঠকানোর চেষ্টা! যাও, বস গিয়ে নিজের জায়গায়!

বীরু যেতে চেষ্টা করে, কিন্তু মাস্টারের হাত আরও শক্ত হয়ে চেপে বসেছে ওর ঘাড়ে, মাস্টার যেন ছানার তাল নিংড়ে জল বের করছে। বীরুর মাথা ঝুঁকে পড়েছে। হেঁচকি উঠছে। চোখ দুটো ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওর প্রাণটাও যেন সেই সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছে। মাস্টার যদি ওকে ছেড়ে না দেয় তো ওর চোখ দুটো বোধ হয় এবার খুলে পড়ে যাবে। ও চোখ বন্ধ করে ফেলে।

— যাও, বস গিয়ে নিজের জায়গায়।

মাস্টার আবার একটা ঝাঁকুনি দেয়, তারপর প্রশ্ন করে — আজ বই আনা হয়েছে, কি হয়নি?

চোখ দুটো না হয় পড়েই যেত, না হয় ও অন্ধই হয়ে যেত কিংবা মরেই যেত। কিন্তু মাস্টার আবার ওই বইয়ের কথা তুলছে কেন?

— বল, বই এনেছিস কিনা?

বলাটা কি এতই জরুরী? না, আনেনি। কিন্তু মাস্টার কথা না বলিয়ে ছাড়বে না! ওর মুখ খুলিয়েই তো আসল মজা!

— বল শুয়োরের বাচ্চা! মুখ খোল! বই এনেছিস কি না?

অন্য ছেলেরা দম বন্ধ করে বসে আছে। প্রথমটা বীরুকে মাস্টারের খপ্পরে

পড়ে ছটফট করতে দেখে ওদের বেশ মজাই লাগছিল। কারও কারও বীরুর পিঠে চড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল, বীরুর বাঁকাচোরা মুখটা দেখে অনেকে হাসি সামলাতে পারছিল না। ওর ফ্যাকাশে সাদা মুখ দেখে অনেকেরই মুখ হাসিতে লাল হয়ে উঠছিল। কিন্তু এখন আর ব্যাপারটা মজার মনে হচ্ছে না, সমস্তটাই এখন ভয়ানক নিষ্ঠুর আর ক্রুর হয়ে যাচ্ছে। কয়েকটা ছেলে মনে মনে এখন প্রার্থনা করছিল মাস্টারের হুঁকোটা যেন চটপট এসে যায়। তাহলে বীরু নিস্তার পাবে। না হলে মাস্টার ওকে একেবারে নিংড়ে ছিবড়ে করে দেবে। এমনিতেই তো বেচারা রোগা একটা ছোট্ট পাখির মতো ক্ষীণজীবী।

— বলবি? না আরও কিছু দাওয়াই দেব কথা বলাবার জন্যে? বল বই এনেছিস কিনা?

একটা ছেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলে — মাস্টারজি, ওর ব্যাগের মধ্যে বই নেই। ছেলেটা বোধ হয় ভেবেছিল এতেই মাস্টারের কৌতূহল মিটে যাবে আর বীরুও মুক্তি পাবে।

— আচ্ছা, তার মানে আজও বই আনা হয়নি? 'আজও' কথাটায় জোর দেওয়ার জন্যে মাস্টার বীরুর ঘাড়টা একেবারে দেহের সমস্ত শক্তিতে টিপে ধরে। বীরু এবার জোরে চিৎকার করে। তখন মাস্টার হেসে ওঠে। এই আর্তনাদটা শোনার জন্যেই তো এতক্ষণ ধরে এত কষ্ট করা!

— এই তো গলা বেরিয়েছে এতক্ষণে! কালকে কি বলেছিলাম? মনে আছে না নেই? বলি, মনে আছে, না নেই?

এই মুহূর্তে বীরু কেন, বীরুর প্রাণকর্তা দেবদূত এলেও তাঁরও কিছু মনে পড়ত না। বীরু তো এখন কিছু শুনতেও পাচ্ছে না ভাল করে।

— মাস্টারজি, ও বেচারি মরে যাবে, সেই ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলে।

মাস্টার হেসে ওঠে, হাতের মুঠিও কিছুটা আলগা হয়।

— এত দয়া এর ওপর, তা এর জায়গায় তাহলে তুমিই এস না হয়?

মাস্টার বীরুকে ছেড়ে দিয়ে সেই ছেলেটিকে কাছে আসতে ইঙ্গিত করে। বীরুর ঘাড় বেঁকে গেছে। মাথা ঝুঁকিয়ে সে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন সে কোনও মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করছে। অন্য ছেলেটি নিজের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকে।

— চলে আয় এদিকে, আসছিস না কেন?

দেখে তো মনে হচ্ছে মাস্টার এখন হাসছে। কিন্তু মাস্টার যে কতখানি চটে আছে সেটা কোনও ছেলের আর বুঝতে বাকি নেই। সকলের চোখ আসলামের দিকে। আসলাম কিন্তু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গায়। মাস্টারের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে আছে। নিজের সাহসের পরীক্ষা নিচ্ছে বোধ হয়।

মাস্টারের মুখের হাসি মিলিয়ে যাচ্ছে। রাগ বাড়ছে ক্রমশ।

বীরু এতক্ষণে পায়ে একটু জোর পেয়েছে, কিন্তু ঘাড়টা এখনও যেন অবশ হয়ে আছে। ঘাড় সোজা করার চেষ্টায় সে এদিকে আরও কি কি ঘটছে সে সব অত বুঝছে না। অনেক ছেলে খুব চিন্তিতভাবে বীরুকে দেখছে, যেন জানতে চাইছে — কি রে, বেঁচে আছিস তো? যা গেল —

— তুই কি ওইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি?

মাস্টারের হুঙ্কার শুনে সবাই চমকে উঠে এদিকে নজর দেয়। বীরুর ঘাড় নিজেই সোজা হয়ে ওঠে। আজ মাস্টার প্রত্যেকটা ছেলেকে পেটাবে। এই সমবেত প্রহারের কল্পনায় ছেলেদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে, শুধু যে ভয়ে তা নয়, কিছুটা উত্তেজনাতেও।

— আসলাম!

মাস্টারের এবারকার গর্জন শুনে আসলাম বোধ হয় একটু দুর্বল হয়ে পড়ে। তার দৃষ্টি নত হয়ে যায়। যেন হার স্বীকার করছে। সে আস্তে আস্তে এগোতে থাকে মাস্টারের দিকে।

একটা ছেলে বীরুর প্যান্টে একটা টান মেরে ওকে চুপচাপ বসে পড়ার জন্যে ইশারা করে।

মাস্টারের কাছে পৌঁছে আসলাম আবার বেশ দৃঢ়ভাবে দাঁড়ায়। মনে হচ্ছে, এইটুকু আসতে আসতে সে মনে মনে কিছু একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে।

— তারপর? উকিল সাহেব? কথাটা শেষ করেই মাস্টার আসলামের মুখে টেনে একটা মোক্ষম চড় কষিয়ে দেয়।

আসলাম চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আলিফ অক্ষরের মতো খাড়া হয়ে। গালে হাত বুলোবার জন্যেও সে হাত তোলে না। চোখের দৃষ্টি স্থির। যেন চড়টা ওর গালে পড়েনি, পড়েছে একটা পাথরের ওপর। বীরু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আসলামের দিকে। নিজের ঘাড়ের ব্যথাও যেন ভুলে গেছে ওই চড়ের বহর দেখে।

মাস্টার আসলামের দিকে তাকায়, তারপর তাকায় ছেলেদের দিকে। একবার নিজের হাতখানাও দেখে তারপর একেবারে যেন পাগল হয়ে যায়। দুই হাতে এলোপাথাড়ি ঠ্যাঙাতে থাকে আসলামকে। এরপরেও যখন আসলাম কাঁদল না, একটা আর্তনাদ পর্যন্ত করল না। তখন মাস্টার দু'হাতে ওর কাঁধে দারুণ ঝাঁকুনি দিয়ে গলা টিপে ধরার চেষ্টা করতে লাগল। আসলাম এবার অবহেলা ভরে মাস্টারের হাত দুখানা ঝটকা মেরে সরিয়ে দেয়। তারপর বলে, — নিয়ম কানুন মেনে লড়াই করুন, ছ্যাঁচড়ামি করেন কেন?

মাস্টারের মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। গালাগাল দেওয়ার জন্যে মুখ হাঁ

করেছিল, সে মুখ আর বন্ধ হচ্ছে না। আসলাম বুক ফুলিয়ে ফিরে যায় নিজের জায়গায়। ছেলেরা উত্তেজনায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে। সকলের নজর এখন আসলামের দিকে। বীরুর ইচ্ছে করছে, আসলামের পাশে গিয়ে বসে।

— হুঁকো কোথায়? যে ছেলেগুলো এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এই সব কাণ্ড দেখছিল, মাস্টার তাদের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে।

— মাস্টারনিজি বললেন, হুঁকো তো নিয়ে যাবে কিন্তু ছিলিমে তামাকের বদলে কি গাধার নাদ ভরে দেব?

সব ছেলে একসঙ্গে হেসে ওঠে খিলখিলিয়ে। মাস্টার দু'একবার গলা খাঁকারি দিয়ে ওদের একটু ভয় দেখাতে চায়। তারপর বেরিয়ে যায় গরগর করতে করতে।

বীরু উঠে গিয়ে বসে আসলামের পাশে।

বাড়ি ফেরার সময় বীরুর পা যেন আর মাটিতে পড়ছে না। সারাটা পথ কেটে যায় হাসি-গল্পে। বন্ধুরা কেউ ওকে জ্বালাতন করছে না। আসলাম অনেকটা পথ ওর সঙ্গে সঙ্গে এসেছে।

বীরু এক নতুন বন্ধু পেয়ে গেছে, এক দরদী বন্ধু। এখন থেকে স্কুলে গিয়ে ওর আর কোনও চিন্তা থাকবে না। ছেলেরা আর ওকে ক্ষ্যাপাতে সাহস করবে না। আসলাম নিজের বুকে হাত রেখে বলেছে,— ফের যদি মাস্টার তোকে ঠ্যাঙাতে আসে তো ওকে শালা মজা দেখিয়ে দেব! সারা শহরের দেওয়ালে কয়লা দিয়ে লিখে দেব, মাস্টার ফকির মহম্মদ একটা গাধা! মাস্টার ফকির মহম্মদের ছিলিমে গাধার নাদ! স্কুলের গেটে ওর ছবি এঁকে নিচে লিখে দেব 'গাধাদের বাদশা'।

পথে আসলামকে ছেড়ে আসার আগে বীরু বলে,—একদিন তোমার বাড়ি যাব।

আসলাম জোর গলায় বলে — নিশ্চয়ই।

বীরুর পাড়ার ছেলেরা ওর পিঠ চাপড়ে দেয়।

এতদিন, বীরু যখন কোনও কিছু নিয়ে চিন্তায় মগ্ন বা একদৃষ্টিতে মাস্টারের দিকে চেয়ে আছে, সেই সময় দুষ্টু ছেলেরা ওর প্যাণ্টের মধ্যে কাঁকর ঢুকিয়ে দিত, তারপর ও উঠে দাঁড়ালেই হাততালি দিয়ে চেঁচাত — দেখ, দেখ বীরু ডিম পাড়ছে। এখন আর কারও সে সাহস হবে না। আসলাম ডঙ্কা মেরে জানিয়ে দিয়েছে — আজ থেকে বীরু আমার বন্ধু! খবরদার কেউ যদি ওর পেছনে লাগিস, মেরে ছাতু বানিয়ে দেব।

কি লম্বা আসলাম। মাস্টারের কাছে যখন দাঁড়িয়েছিল মাস্টারের চেয়েও ওকে উঁচু দেখাচ্ছিল। কি ধবধবে সাফ জামা-কাপড় পরে। মাথায় গন্ধ তেল মাখে। আর ওর বুটজুতো। আসলামের দারুণ জুতোজোড়ার কথা মনে পড়তেই বীরুর দৃষ্টি চলে যায় নিজের খালি পা দুটোর দিকে।

দেবী এসে দরজা খুলে দেয়। এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে বাড়িতে ঢুকেই বীরু চেঁচিয়ে ওঠে — রুটি দাও মা, খুব খিদে পেয়েছে।

কিন্তু মা এখন মুখ ভার করে দেউড়ির এক কোণে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

— তাহলে এই চিঠির কি জবাব দেব বল? বাবার গলা শুনেও বীরুর এখন আর ভয় করে না। সে লাফিয়ে বাবার হাতের চিঠিখানা নিতে চেষ্টা করে। বাবা হাত ওপরে ওঠায়। অন্য হাতে বীরুর গাল চাপড়ে দেয়। বীরু বুঝতে পারে, এই মিষ্টি চাপড়ের সঙ্গে বাবার গোমড়া মুখের কোনও সম্পর্ক নেই। চাপড়ের মধ্যে যে আদর লুকিয়ে আছে তার উষ্ণতা ও অনুভব করতে পারে — মুখের রাগী রাগী ভাবটা মায়ের জন্যে আর আদরটা ওর জন্যে।

— বল, আমাকে আবার কাজে যেতে হবে।

— আমি তো বলেই দিয়েছি, আমার পছন্দ নয়।

— তাহলে তোমার ইচ্ছেটা কি তাই শুনি। একে কি সারা জীবন এ বাড়িতেই পুষে রাখবে? কোনও কালে কখনও কোনও কিছুই কি পছন্দ হয় তোমার?

— যাই হোক, ঐ হতচ্ছাড়া রামলালকে আমি মেয়ের কাছে ঘেঁসতেও দেব না, বিয়ের সম্বন্ধ তো দূরের কথা।

— কিন্তু তার দোষটা কি একটু ভেবে চিন্তে কাজ করতে হবে তো। আকাশ থেকে কোনও দেবদূত পেড়ে আনবে নাকি তুমি? এ দশক্লাস পাশ করেছে, চাকরি করে। দেখতে শুনতে ভাল।

— ছাই ভাল।

— তোমার কাছে তো সব কিছুই ছাই।

— আমি ওর হাড়হদ্দ জানি।

বীরু খাবারের কথা ভুলে গেছে। খুব মন দিয়ে ওদের কথা শুনছে। বাবা আজ বেশ ভাল করে কথা বলছে তো? এই রামলালটা আবার কে? চিঠিতে কি আছে? হাড়হদ্দ শুনেও হাসি পেয়ে যাচ্ছে বীরুর।

— বেশ, তাহলে না বলে দিই?

— তা ছাড়া আবার কি। ওই বাড়িতে মেয়ে দেওয়ার চেয়ে মেয়েকে কুয়োয় ফেলে দেওয়াও ভাল।

— আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, আর বাজে বকবক করতে হবে না।

— বাজে বকবকই বল, আর যা-ই বল, আমি বেঁচে থাকতে কিছুতেই...

— একটা কথারও কি সোজা উত্তর দিতে পারো না?

বাবা চিঠিটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বাইরে চলে যায়। বীরুর মনে হয়, আজকের ঝগড়াটা যেন মাঝপথেই থেমে গেল।

— রামলাল। হুঁঃ ওর মা-ই তো আমার গয়নার বাক্স সরিয়েছিল, তাকে

মেয়ে দেব? গোল্লায় যাক সব। কোনও ছিরি ছাঁদ নেই, কালো ভূত। যেমন বুদ্ধি, তেমনই রূপ। মেয়েটা যদি আমার একটু ভাল হত তো এত তাড়াহুড়ো করার কোনও দরকারই হত না।

মা কথা বলেই চলেছে, অভ্যাস ছাড়বে কি করে? নিজেই চুপ করে যাবে এক সময়ে। কিছু খেতে পেলে ভাল হত ... সব বাসন এঁটোমাখা হয়ে পড়ে আছে। খাবার মতো কিছু চোখেও পড়ছে না। উনুন থেকে হাল্কা ধোঁয়ার দু'তিনটে রেখা উঠে ছাদে ঠেকছে। বারান্দায় পড়ে থাকা একটা খালি গ্লাসে ঠোক্কর মেরে বীরু বেরিয়ে আসে রান্নাঘর থেকে।

— সাবাশ! তুমিই বা পিছিয়ে থাকবে কেন বাপের থেকে। যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা! ভাঙ ভাঙ, সব বাসন-কোসন ভেঙে ফেল! দেখছিস কি হাঁ করে?

ঘৃণাভরা একটা দৃষ্টি মায়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বীরু বেরিয়ে যায় বাইরে। রুটি না জোটে তো নাই জুটুক, কিন্তু আজ ও কিছুতেই মায়ের বকবকানি শুনবে না!

এগারো

বাচ্চারা গলিতে নেচে নেচে গাইছে

রব্বা রব্বা মীংহ্ বসা ...
সাহ্ডী কোঠী দানে পা ...

ক'দিন থেকে রোজই খুব ঘন হয়ে মেঘ করে আসে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে না। পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করছে, দেবতা আমাদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন।

বাচ্চাগুলো আকাশের দিকে মুখ তুলে নাচছে বাঁদরের মতো। বীরু দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চুপচাপ, দেখছিল ছেলেগুলোকে। মেঘ কেবল আকাশে নয়, ওর মুখের ওপরেও ঘনিয়ে রয়েছে। আকাশের মেঘ তো চঞ্চল, গর্জন করে, নড়েচড়ে বেড়ায়, কিন্তু ওর মুখের মেঘে কেবল অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা।

কালিয়া ইট্টা কালে রোড় ...
মিংহ্ বসা দে জোরো জোর ...

বাচ্চারা প্রাণপণে চিৎকার করে ছড়া কেটে বর্ষার মেঘ ডাকছে। মেঘও যেন ছড়া শুনে ছেলেমানুষের মতো চঞ্চল হয়েছে আকাশে, মাঝে মাঝে ওদের ছড়ার জবাবে মেঘও যেন নিজের ভাষায় কিছু বলে উঠছে।

বীরু কেবল বাচ্চাদের ছড়াগুলোই শুনছে, কিন্তু ওই বাচ্চারা বোধ হয় বুঝতে পারছে মেঘের ভাষা।

মাঝে মাঝে বীরু তাকাচ্ছে আকাশের দিকে, মেঘের অথৈ সমুদ্রে ঢেউ খেলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিক তীব্র রেখায়, ধারালো ছুরির ফলায় মেঘের বুক চিরে ফালা ফালা করে দিচ্ছে যেন কেউ। বিদ্যুতের রেখা এঁকেবেঁকে এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে, যেন গায়ে আলো জ্বেলে একটা ঝিকমিকে ব্যাঙ নাচছে আকাশে। আবার কখনও সারা আকাশ একেবারে শান্ত, মেঘেরা যেন হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু বাচ্চাদের চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় মেঘের। রেগে যাওয়া বুড়োর মতো গলা খাঁকরে মেঘ তখন মানুষগুলোকে নিজের উপস্থিতি জানান দেয় আবার।

রব্বা রব্বা মিংহ্ বসা ...
সাহ্‌ডী কোঠী দানে পা ...

বীরু দরজার সামনের রোয়াকে বসে পড়ে। দুই হাতে হাঁটু জড়িয়ে হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে দীর্ঘশ্বাস টানে। মেঘের সঙ্গে দানার কি সম্পর্ক? আজ বাড়িতে একদানা খাবার নেই। আটা নেই, রুটি নেই, পয়সাও নেই। ক'দিন ধরেই মা এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে একসের, দু'সের আটা ধারে এনে রুটি বানাচ্ছে। রুটি সেঁকতে সেঁকতে মা বলে, — ধার নিয়ে কোনও লাভ হয় না। ধার করা আটা যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না, কাঁকর মেশানো থাকে। পাশের বাড়ির বিদ্যা একদিন শেষের কথাটা শুনতে পেয়ে বলে উঠেছিল, — কে তোমাকে ধার নেওয়ার জন্যে সাধাসাধি করে বল তো? আটাও দেব আবার কথাও শুনব? এতদিন যা দিয়েছি, দিয়েছি, কিন্তু এবার যদি চাইতে আস তো ...। মা তখন একেবারে বেপরোয়া দিব্যি গেলে শুরু করে দেয়,— ও মা, তোমাকে কি বলেছি নাকি? ভগবানের দিব্যি, তোমার আটা তো ময়দার চেয়েও মিহি। ও তো আমি এমনিই কথার কথা বলছিলাম। তারপর বীরুর মাথায় হাত রেখে মা বলে, — এই ছেলের দিব্যি, আমি যদি তোমার নামে বলে থাকি। তারপর বিদ্যা পিছন ফিরতেই মায়ের চোখ ভরে জল এসে গিয়েছিল।

কালিয়াঁ ইট্টা কালে রোড় ...
মীংহ্ বসা দে জোরো জোর...

মেঘ যদি বৃষ্টি দেয় তো এই শালাদের কি লাভটা হবে? যখন উনুনে আগুন থাকে সেই সময়ই তো বর্ষা হওয়া উচিত। বৃষ্টিও পড়ছে, এদিকে খাবারও কিছু নেই, এর চেয়ে কটকটে রোদ্দুরও ভাল। বর্ষার দিনে বেশি খিদে লাগে। যখনই বৃষ্টি পড়ে, বৃষ্টির ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে গলিতে ভাসতে থাকে পুরি আর পকৌড়ার সুগন্ধ।

বীরুর মনে হয়, কেউ যেন ওর মুখের সামনে পুরি-কচুরির থালা তুলে ধরেই গালের ওপর সজোরে চড় কষিয়ে দিয়েছে।

রব্বা রব্বা মিংহ্ বসা ...
সাহ্‌ডী কোঠী দানে পা ...

এই শালাদের বাড়িতে তো অনেক দানাপানির ব্যবস্থা আছে। তা না হলে এতক্ষণ ধরে আর নাচতে হত না! হারামিগুলো নিশ্চয়ই *ঠেসে* খেয়েছে, খালি পেটে তো ভালুকও নাচতে পারে না। মা তো কেবল বলে, — হায়রে, সকলের ঘরে সব আছে, শুধু আমার ঘরেই কিচ্ছু নেই! আমার দশা তো ভিখিরিরও অধম।

মেঘ ডাকল জোরে। বাচ্চারা চেঁচিয়ে *ওঠে* — কন মন, কন মন ... ছোট ছোট বৃষ্টির বিন্দু পড়ছে বীরুর ঘাড়ে মুখে, বৃষ্টি যেন ওকে সুড়সুড়ি দিয়ে খ্যাপাচ্ছে। কিন্তু ও একটুও নড়ে না, শিউরেও ওঠে না। বীরুর সব কোমল অনুভূতির ওপর কেউ যেন একটা কচ্ছপের খোলা পরিয়ে দিয়েছে।

ছেলেগুলো লাফালাফি করছে ঠিক যেন দোকানির কড়াইয়ে মকাই দানা। বীরু একটা মাটির ঢেলা তুলে একটা ছেলের দিকে ছুড়ে মারে। তারপর আবার গিয়ে বসে রোয়াকে। কেউ ওকে লক্ষ্য করে না।

হাঁটুর ওপর হাত জড়িয়ে বসে ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাস্তার ঐ ছেলেগুলোর দিকে। দেখতে দেখতে ভিজে ওঠে ওর চোখের পাতা। ইচ্ছে করে, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাটিতে পা ঠুকে ঠুকে গলা ফাটিয়ে কাঁদে। কিন্তু ও সেসব কিছুই করে না। হাতের আড়ালে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে শুধু কাঁদে।

দরজা খুলে গেল। বীরু ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। পিছনে মা দাঁড়িয়ে। দেখে লোকে ভয় পেয়ে যাবে এমন চেহারা! বীরু রোয়াক ছেড়ে নেমে পড়ে রাস্তায়।

— যা, বাজার থেকে ওঁকে ডেকে নিয়ে আয়।

বীরু আকাশের দিকে তাকায়। মা বোঝে ও কি ভাবছে। কিন্তু ওর কোনও অজুহাতই মা স্বীকার করতে রাজি নয়।

— কিছু হবে না, যা। গায়ে দু'ফোঁটা বৃষ্টি পড়লে তুই গলে যাবি না। নুনের শরীর তো নয়, জল লাগলে গলে যাবে? ওই তো দেখ্ না, ওরাও তো ছোট ছেলে। কত আনন্দ করে খেলাধুলো করছে সব। আর তুই ছেলে, ঠায় এই রোয়াকে বসে থাকা ... যেন আধমরা ...।

মা যা মুখে আসে বলে দেয়। ঠিক আছে, আধমরা তো আধমরাই! সকাল থেকে এক টুকরো রুটিও খাইনি, আধমরা হব না তো কি গামা পালোয়ান হয়ে যাব? এদিকে তো খেলতে গিয়ে একটু দেরি হলেই চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করা হয়! ওই ছেলেরা, যাদের পেট ঠাসা খাবার — ওদের সঙ্গে আমার তুলনা হচ্ছে! এই সব দোষ যদি মায়ের না থাকত...

— যা না! এখনই বৃষ্টি আসবে। ঘরে আটা, ঘি, কাঠ কিচ্ছু নেই। যা, নিয়ে আয় ডেকে।

আরও একটু গলাটা চড়াও মা, যাতে সবাই শুনতে পায়। আগে আগে ও বলে ফেলত, লজ্জা করে মা। বাবার বন্ধুরা সব আমাকে ক্ষ্যাপায়। মা দু'চারটে চড়-চাপড় আর বাছা বাছা কিছু গালাগাল দিয়ে সেই লজ্জা দূর করে দিত। কিন্তু এখন তো ওই কথাটুকু বলতেও লজ্জা করে। সব কিছুতেই লজ্জা করে আজকাল। মায়ের হাতে মার খেলে লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করে। মায়েরও এমন বাজে অভ্যাস, যেখানে সেখানে পিটতে আরম্ভ করে দেয়।

— এখন বাবা কোথায় কি করে জানব?

— যেখান থেকে পারিস খুঁজে আন গে। এই আশেপাশেই আছে কোথাও। বিলেত তো আর চলে যায়নি।

গজগজ করতে করতে চলে যায় বীরু। বাচ্চারা এত চেঁচাচ্ছে, যে এখন এই গজগজানি ওর নিজের কানেও পৌঁছায় না। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ও চোখ

তুলে ওদের দেখার চেষ্টাও করে না। যে ছেলেগুলো এতক্ষণ সর্বশক্তিমান রব্বা আর মেঘের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল তারা এবার বীরুকে দেখেই চেঁচাতে শুরু করে নাম ধরে। বীরু একছুটে গলিটা পার হয়ে ঢুকে যায় বাজারের মধ্যে। বাচ্চাগুলো গলির মোড় থেকেই পিঠটান দেয়, পাড়ার কুকুরগুলো বেপাড়ার কুকুরকে ভাগিয়ে যেমন ফিরে আসে নিজেদের এলাকায়।

বাজারের মুখেই একটা কাপড়ের দোকান। সে দোকানে কাপড় এত কম, দর্শকের সংখ্যা এত বেশি যে খদ্দের দূর থেকে দেখেই কেটে পড়ে। বাবা সাধারণত সেখানে বসেই তাস খেলে। দোকানদারের নাম সরদারী, লোকে ওকে দারী বাজাজ বলে ডাকে। দোকানদারিতে তার বিন্দুমাত্র মন নেই, পথ চল্‌তি মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করাই তার আসল কাজ।

— এস, এস নন্দলাল ... মদনগোপাল! কি খবর বল শুনি? মা পাঠিয়েছে বুঝি? ভগবান করুন, শত্রুও যেন তোমার মায়ের কবলে না পড়ে!

দারী বাজাজের এই রসিকতার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝল না বীরু। বাবা কিন্তু এখানে নেই। থাকলে, বীরুকে দেখেই বাবা ঠিক বাইরে বেরিয়ে আসত। বীরুর ডাকতে আসতে যত লজ্জা করে, বাবার তার চেয়েও বেশি লজ্জা করে, তাকে ডাকা হচ্ছে বলে। বীরুকে দূর থেকে দেখতে পেলেই বাবার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় — ছেলে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে বলে। তারপর বীরুর সঙ্গে চলতে চলতে গজগজ করতে থাকে, — কোথাও শান্তিতে দু'মিনিট বসতে দেবে না আমাকে!

— ওহে নন্দলাল, তোমার মায়ের আবার কি সমস্যা হল বল তো, যে বাবার খোঁজখবর হচ্ছে?

দোকানে যারা বসে ছিল তারা সবাই হাসতে শুরু করে। বীরু ঘামছে লজ্জায়, রাগে কাঁপছে। যেন মাটিতে মিশে গিয়ে কোনও মতে সরে যায়।

সরদারীর দোকান ছাড়িয়ে একটু এগোলেই এক ঘড়ি মেরামতের দোকান। ঘড়িওয়ালার দুটো পা-ই নেই। আগে আগে বীরুর কেন কে জানে, মনে হত, পা নিশ্চয়ই আছে, নিচের দিকে কোনও ভাবে লুকিয়ে রেখেছে। কিন্তু একদিন ও পরিষ্কার দেখেছে পায়ের জায়গায় শুধু দুটো ঠুঁটো, দেখলেই শিউরে উঠে লোকে কানে হাত দেয়, নয়তো চোখ বোজে, কুড়ুল দিয়ে পা কেটে ফেলছে কল্পনা করে কেউ বুঝি কেঁপেও ওঠে। কিন্তু ঘড়িওয়ালার দেহের ওপর দিকটা দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট, ওপরটা দেখে লোকটার জন্যে সহানুভূতি জাগে না। কষ্ট হয় কেবল ওর পা দুখানার জন্যে। লোকটার ভাবভঙ্গি আর কথাবার্তার ধরণটাই এমন যে দেখেশুনে অনেকেরই মনে হয় পা ঠিক থাকলে সে জাঁদরেল মানুষ হত।

ঘড়িওয়ালার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বীরু এদিকে ভুলেই গেছে সে কি কাজে বাজারে এসেছে। দোকানটা দেখে মনে হয় এটারও বুঝি পা ভেঙে গেছে। ছাদ নেই, দরজা নেই, কোনও মতে দু'পাশের দুটো দোকানের মাঝখানের

ফাঁকটুকুতে আটকে আছে। লোকে ওকে বলে, 'টুত্তা লাট'। আসল নামে কেউ ডাকে না ওকে। কত বছর ধরে যে ও এখানে আছে, আরও কত বছর যে থাকবে তা কেউ জানে না। ওর বয়সী বেশির ভাগ লোক মরে গেছে, নয়তো এত বুড়িয়ে গেছে যে তাদের আর বাজারে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায় না। লোকে বলে ও নাকি বছরের পর বছর একটা মাত্র ঘড়িকেই একবার সারায়, আবার বিগড়ে দেয়। ওর চারদিকে সাজানো শাক-সবজির টুকরি। সবজি কিনতে যখন খদ্দের আসে না সেই সময়টা কাটানোর জন্যে ঘড়িটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে ও কত ব্যস্ত তাই দেখাতে চায়। সবজি কিনতে খদ্দের এলে আবার তাদের সঙ্গে ঝগড়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এইভাবে কি করে কখন ওর সবজিগুলো বিক্রি হয়ে যায়, কে জানে!

এ দোকানের সবজি প্রায়ই বাসি হয়। যতক্ষণ সবজিগুলো তাজা থাকে ততক্ষণ একপয়সাও দাম কমাতে বললেই ও এমন তেড়ে আসে, খদ্দের পালাতে পথ পায় না। তারপর সব যখন বাসি হয়ে যায়, তখন ও পথচলতি লোকদের নাম ধরে ডেকে ডেকে অনুরোধ করে, — এস, এস, একপো মটর তো নিয়ে যাও অন্তত। এর চেয়ে সস্তা আর পাবে না। এখন তো যাদের কাছে বিষ কিনে খাওয়ার মতো কানাকড়িও নেই, তারাও মটর খাচ্ছে। ওহে দারী বাজাজ, সারা জীবন কি কেবল মুগের ডাল খেয়েই কাটাবে? আরে ভাই, কখনও-সখনও মাংস আর শাক-সবজিও একটু মুখে তুলে দেখ!

বাসি হতে হতে সবজিগুলোর রং এমন পালটে যায়, মাঝে মাঝে ওর টিণ্ডাগুলো পাথরের টুকরোর মতো দেখায়। শুকনো করলাগুলো ঠিক যেন ঝিঙে।

মা বলে টুত্তার স্বভাব ভাল নয়, ওজনে কম দেয়। কিন্তু বীরু দেখেছে, অনেক সময় টুত্তা তো ওজন করেই না। দু'হাতের অঞ্জলি ভরে জিনিস তুলে দু'চার বার হাত ঝাঁকিয়ে বলে, — এই নিয়ে যাও, আধ সের আলু। ওর হাতের অন্দাজকে কোনও কোনও খদ্দের যখন কিছুতেই মানতে চায় না তখনই কেবল ও দাঁড়িপাল্লা ব্যবহার করে। ... আরে ভাই, আমার হাতই দাঁড়িপাল্লা, সারাটা জীবন এই করছি নিতে হয় নাও, না হলে বাজারে তো আরো ঢের সবজির দোকান আছে।

বুদ্ধিমান লোকজন ও পথ মাড়ায় না। বড়জোর টাকাখানেক সবজির হেরফের হবে তার জন্যে কে এখন সারা বাজারের সবজির দোকানে চক্কর দিতে যায়?

বীরু দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। বাবাকে খুঁজতে ও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল, সে কথা এখন ভুলে গেছে। হঠাৎ মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায়। ও এগিয়ে গিয়ে টুত্তাকে বলে — চার পয়সার টিণ্ডা দাও।

কিন্তু টুত্তা তখন অন্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত, — আরে মশাই, কদ্দুর চেয়ে ভলে সবজি আর কি কিছু আছে? হাকিম আজমল খাঁ তাঁর ওষুধের মধ্যে পর্যন্ত কদ্দু (লাউ) ব্যবহার করেন। সোজা কথাটা বলুন না মশাই, আপনার কেনাকাটা করার ইচ্ছেই নেই, শুধু শুধু ঠাট্টা করছেন! সময় কাটাবার এও একটা উপায়, যে কোনও

একটা জিনিস তুলে নাও আর তার নিন্দে করতে থাক। আপনার তো সাহেব শুধু মুখই চলছে কিন্তু অন্যের যে সময়টা নষ্ট হচ্ছে সেটা কি ভেবেছেন? দরকারের চেয়ে বেশি ফুরসৎ খোদা যেন কাউকে না দেন।

খদ্দের বেচারা একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকে। হয়তো নতুন এসেছে এখানে। তারপর হাসি ঠাট্টা কিছুই না করে সে নাক কুঁচকে বলে — অত বক্তৃতা দেওয়ার দরকার নেই। যা আমার দরকার, তাই নেব।

— ঠিক আছে, ঠিক আছে, বেশি কথা বাড়াবেন না। আপনি এখন আসতে পারেন। অন্য কাউকে গিয়ে জ্বালাতন করুন। আমি দোকানদার, আপনার কেনা গোলাম তো নই?

লোকটা ঠিক বাবার মতো মুখ গোমড়া করে হাঁটতে শুরু করে। বীরুও চলতে থাকে তার পিছনে, যেন ওই লোকটাই বাবা। ওই দোকানটা পেরিয়ে যেতেই আবার বীরুর নজর পড়ে আকাশের দিকে। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের সমুদ্র। গুড়গুড় করে মেঘ ডাকছে — কারও মাথার ওপর যেন বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়ছে। বাচ্চাগুলো এখনও হয়তো নাচানাচি করছে গলিতে। বাজারে কিন্তু বৃষ্টিকে স্বাগত জানাবার কোনও প্রচেষ্টা চোখে পড়ছে না। বৃষ্টি পড়লে ছোটরাই বোধ হয় সবচেয়ে খুশি হয়। সেই সাত-সকালেই তো মা দু'খানা শ্লোক ঝেড়েছিল। দেবী মায়ের দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসছিল আর বাবা মা, দুজনকেই একসঙ্গে চুলোয় যেতে বলেছিল। সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি বীরুর। মেঘ দেখে তো পেট ভরে না!

সামনেই বাবা আর রামসিংকে আসতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে বীরু। রামসিংয়ের ঘন গোঁফের ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে মুচকি হাসি, ঠিক যেন গর্তের ফুটো থেকে ইঁদুরের মতো। বাবার কপালে একটা বড় ত্রিশূল আঁকা।

— এখানে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?

বীরু বাবার আঙুল ধরে বাড়ির দিকে টানতে থাকে, যেন বুদ্ধিমানকে ইশারা করছে। বাবা ইশারাটা বুঝল, রামসিংকেও বুঝিয়ে দিল।

বাবার চোখ মাটির দিকে, নিজের পদক্ষেপ গুনছে যেন। কপালের ওপর ত্রিশূলটা। মোটেও ভাল দেখাচ্ছে না। ঢিলেঢালা পাগড়ির নিচে এলোমেলো চুলের গোছা, ঠোঁটের কোণায় ঝুলে পড়া হলদেটে গোঁফ, ছোপধরা দাঁত, গালে না-কামানো সাদা সাদা ... ভাগ্যিস বাবা ওকে কখনও চুমো খায় না।

গলিতে ঢুকে বীরু বাবার আঙুল ছেড়ে দিয়ে একছুটে বাচ্চাদের দলে ভিড়ে যায়। চেঁচাতে থাকে — রব্বা রব্বা মিংহ্ বসা! সাহুডী কোঠী দানে পা! বাচ্চাগুলো কিন্তু হঠাৎ চুপ করে যায়। বীরু কিছুক্ষণ একাই চেঁচিয়ে যায়। বাচ্চারা লাফানো বন্ধ করে। বীরু একাই লাফাতে থাকে। বাচ্চারা ওর কাছ থেকে সরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। থেমে গিয়ে বীরু ওদের দিকে তাকায় ওর দু'চোখে প্রশ্ন। নিস্তব্ধতার মধ্যে বাবার গলা খাঁকারির শব্দ শোনা গেল। বাচ্চারাও বোধ হয় তাই চুপ। বীরু আর লাফঝাঁপ, চিৎকার না করে চুপচাপ মাথা নিচু করে বাড়ির দিকে এগোয়।

বাবা দাঁড়িয়ে আছে দেউড়িতে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে হাতে ধরা একটা চিঠির দিকে। হাতখানা কাঁপছে। মা-ও একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে। মাথার চুল উসকোখুসকো, যেন এইমাত্র কারও সঙ্গে কুস্তি লড়েছে। দেবী এককোণে বসে খোকাকে কোলে নিয়ে।

বাবা চিঠিটা তালগোল পাকিয়ে ছুড়ে ফেলে দিল নালিতে তারপর মায়ের দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

বীরু বুঝতে পারে, চিঠিতে কি খবর এসেছে। কিছুদিন আগেও একটা চিঠি এসেছিল, তাতে দাদীর অসুখের খবর ছিল। দাদী বোধ হয় মারা গেছে। অসুখের কথা শুনে বীরু বাবাকে অনেক প্রশ্ন করেছিল দাদীর সম্বন্ধে। কিন্তু এখন বীরু একেবারে গম্ভীর, যেন অসুস্থতা ও মৃত্যুর মধ্যে কি আর কতখানি পার্থক্য তা ও বেশ বুঝতে পারছে।

— কবে হয়েছে?

— গত সোমবার?

— চিঠিটা আসতে খুব দেরি হয়েছে।

বাবা মায়ের এই মন্তব্যের কোনও জবাব দেয় না। দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে বাবা। একটু পরে মাকে জিজ্ঞেস করে — তোমার কাছে কিছু টাকা আছে কি?

মা মাথা নেড়ে জানায়, কিছু নেই।

মা যে আর কিছুই করল না এটাতে বীরুর খুব আশ্চর্য লাগে।

— দেবী, তোমার কাছে?

— না।

বাবা বীরুর দিকে তাকায়, যেন তাকেও প্রশ্ন করছে। তারপর মাথা চেপে ধরে বসে পড়ে। কান্না থেমে গেছে এখন। বীরুর হঠাৎ মনে হল দাদীর সঙ্গে সঙ্গে মা যদি মরে যেত তাহলেও বোধহয় ওর কান্না পেত না। কিছুক্ষণ পরে বীরু ডুকরে কেঁদে উঠল।

বারো

দাদী যেখানে মারা গেছে সেইখানে চলে গেছে মা, বাবা আর খোকা। আজ তিন চার দিন হয়ে গেল। এই কদিনে দাদীর মৃত্যুশোক দেবী আর বীরু একটু একটু করে প্রায় ভুলে গেছে।

বাবা আর মা যেখানে গেছে সেই জায়গাটার নাম বীরু এখনও ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারে না। নামটা খুব শক্ত। বলতে গিয়ে ও উলটে পালটে ফেলে, কখনও একটা বাড়তি অক্ষর জুড়ে যায়, কখনও বা কিছু বাদ পড়ে যায়, শুনে নিজেই হেসে ফেলে। দেবীও সেই সঙ্গে হেসে উঠে বলে, — বীরু, তুই একটা আস্ত পাগল!

সারাক্ষণ বীরু দেবীকে কত রকম উলটো পালটা প্রশ্ন করে, দেবী কিন্তু বিরক্ত হয় না। ওর কথায় যোগ দেয়, প্রশ্নের উত্তর জোগায়, ওকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে খ্যাপায়ও। তারপর দুজনে মিলে গলা খুলে হেসে ওঠে, সে হাসিতে এক ফোঁটাও কালি থাকে না।

মাঝে মাঝে ও একলা বসে বসে দাদী আর মায়ের মুখে শোনা প্রবচন আর মজার মজার শব্দগুলো উচ্চারণ করে, মাঝে কিছুদিন এগুলো সব ভুলে গিয়েছিল — কুটুর কুটুর, ... ক্রম্ ক্রম্ ... তুখুতুখুঁ ...

— তুই ঠিক একদিন পাগল হয়ে যাবি।

বাড়ির আবহাওয়ায় এমন চমৎকার একটা হালকা ভাব এসেছে, সব সময় যেন মিষ্টি ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। দেউড়ির অন্ধকার কোণগুলোয় যেন ফোটা ফুলের আভাস। মা যাওয়ার পর দেবী সারা বাড়ি ঝেড়ে মুছে এমন পরিষ্কার করে ফেলেছে যে বীরুদের বাড়ি আর দেবীর বন্ধু পারোর বাড়ির মধ্যে বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। পারোদের বাড়ি তো সব সময়ই ঝকঝক করছে।

আগুন জ্বলে এখনও, কিন্তু তা থেকে ধোঁয়া বেরোয় না। মা বোধ হয় ধোঁয়াগুলো সঙ্গে নিয়ে গেছে। বীরুর সব সময়ই একটু একটু খিদে পায়।

— তোর তো দেখি পেটই ভরে না কিছুতেই।

— কথা দিয়ে কি পেট ভরে নাকি?

সব সময় ওদের মধ্যে এমন ভালবাসায় মাখা খুনসুটি চলছে। মা চলে যেতেই দেবী যেন তাজা ফুলটির মতোই ফুটে উঠেছে।

দেবী রুটি সেঁকছে। বীরু চুপি চুপি গিয়ে ওর বিনুনি ধরে টানে, কিন্তু এত জোরে নয় যাতে দেবী চটে যেতে পারে। দেবী আর পারো যখন ফিসফিস করে গল্পে মগ্ন তখন বীরু ওদের কাছে এসে চাপা গলায় বলে ওঠে — মা এসে গেছে।

ওরা দুজনে শুনেই এমন ভয় পেয়ে যাওয়ার ভান করে যে বীরু খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। আসলে কিন্তু ওরা সবাই জানে, এটা বাজে কথা। তবু বীরুকে খুশি করার জন্যেই ওরা ভয় পাওয়ার অভিনয় করে।

মাঝে মাঝে ও আটার খালি টিনটা তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করে — আটা শাটা নুক শুক ... তারে গায়ে লুক ছুপ ...

গানের কথাগুলি সব ওর নিজের বানানো। শব্দগুলো জুড়ে জুড়ে গানটাও ওরই রচনা। দেবী শুনেই ছুটে গিয়ে ডেকে আনে পারোকে। ওরা দুজনে তালি বাজায় আর ও ঠিক ভালুকের মতো নাচতে থাকে। একবার তো বীরু এতই হইচই বাধিয়েছিল যে জলালপুরণী কি একটা ছুতো করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। বীরু তখনই বুঝে গিয়েছিল জলালপুরণী মাকে সব বলে দেবে, খুব নুন-লঙ্কা মাখিয়ে মুখরোচক করেই বলবে। কথাটা মাথায় আসতেই হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গিয়েছিল দু'এক মুহূর্ত, বেশিক্ষণ সে ভয় টেঁকেনি। বরং জলালপুরণীকে উত্যক্ত করার জন্যে সে আরও জোর গলায় শোরগোল শুরু করে দেয়। জলালপুরণীর দাঁতগুলো নিচে ঝুলে পড়েছে। দেবী কপট রাগ দেখিয়ে বীরুকে বকে ওঠে, ব্যস, খুব হয়েছে, এবার থাম তো, বাঁদর কোথাকার! সেই সময় পারো এসে হাজির। পারো এসেই বীরুকে নিজের কাঁধে তুলে নেয়। যাওয়ার সময় জলালপুরণী বিড়বিড় করে কি সব বলছিল। কিন্তু সে বেরিয়ে যেতে না যেতেই বীরু এত জোরে গলা ফাটিয়ে হেসে ওঠে যে দেবী আর পারো হাসি চাপতে নিজেদের মুখে কাপড় গুঁজে দেয়।

মাঝে মাঝে বীরু অকারণেই লাফায়, চেঁচাতে থাকে — রব্বা রব্বা মিংহ বসা ... সাহ্ডী কোঠী দানে পা ...।

পাড়ার সব বাচ্চার সঙ্গে বীরুর এখন খুব ভাব। ওরা নির্ভয়ে ওর বাড়ি চলে আসে। বলে, এখন আর ভয় কিসের? বীরুর মা তো এখানে নেই। বীরুও যায় ওদের বাড়ি। ছেলেরা বলে, যেদিন থেকে মা চলে গেছে বীরুর যেন ডানা গজিয়েছে। কোনও বন্ধুর মা বলে, কি রে বীরু, তোর মায়ের তো ফেরবার সময় হল। বীরুর তখন মনে হয় যেন ওর ডানা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে।

যাওয়ার আগে মা ওকে অনেক উপদেশ দিয়ে গেছে। বলেছে, দেবীর দিকে নজর রাখবি। যখন যেখানে যাবে, ওর পেছন পেছন যাবি। কার কার কাছে যায় সব আমাকে বলবি। বাড়িতে থাকবি। সূর্য ডোবার আগে নিশ্চয় করে বাড়ি ফিরে

আসবি। শরীরের দিকে নজর রাখবি। একপাল বাচ্চা যেন ভিড় না করে। দরজা সব সময় ভেতর থেকে বন্ধ রাখবি। রোদে ঘুরবি না, বৃষ্টিতে ভিজবি না। দেবীকে কখনও চোখের আড়াল করবি না ...

বীরু এখন এত রকম বিধিনিষেধ সব ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে।

আজ ওদের পারোর বাড়িতে নেমন্তন্ন। দেবী আর পারো দুজনে রান্নাঘরে বসে গল্প করছে। বীরুর মনে হচ্ছে, ওরা খুব জটিল কোনও একটা সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করছে। ও অনেকক্ষণ ওদের কথাবার্তা শুনেও কিছুই বোঝেনি। শেষ পর্যন্ত একা একা খেলতে শুরু করেছে। আরও কেউ কেউ এসেছেন নেমন্তন্ন খেতে। দেবী আর পারো তাদের সম্বন্ধেই কথা বলছে।

পারোর মা এক কোণে বসে মালা জপ করছেন। তাঁর চোখ বন্ধ, ঠোঁট নড়ছে ধীরে ধীরে। সেই দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে বীরু। ওর ইচ্ছা করছে মালাটা টেনে নিয়ে একছুট দেয়। কিন্তু আবার ওর মনোযোগ চলে যায় দেবী আর পারোর দিকে। ওরা দুজনে চাপা গলায় গান গাইছে। চুপ করে একটু গান শোনার পর বীরুও গাইতে শুরু করে। ওরা তাই শুনে নিজেদের গান থামিয়ে হেসে ফেলে। বীরু একলাফে এগিয়ে এসে টান মারে ওদের বিনুনি ধরে। ওরা মুখে উঃ আঃ করলেও হেসেই চলেছে। বাবা যখন মায়ের বিনুনি ধরে টানে আর মোচড় দেয় তখন মা-ও উঃ আঃ করে, কিন্তু মায়ের গলায় ফোটে যন্ত্রণা আর কষ্ট। সে জায়গায় পারো আর দেবীর উঃ আঃ-র মধ্যে বীরু যেন একটা নতুন উন্মাদনা অনুভব করে। ওর হাতের মুঠি ঢিলে না হয়ে বরং আরও শক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ওদের গলায় এবার বিরক্ত ফুটছে। ও বিনুনি থেকে হাত সরিয়ে নেয়। তারপর নিজের হাতটা চেয়ে চেয়ে দেখে। হাতের দিকে তাকাতেই মনে পড়ে বাবার কথা। বাবা মাকে মারধোর করার পরই এই ভাবে নিজের হাতের দিকে চেয়ে থাকে, যেন হাতটাকে কিছু প্রশ্ন করছে। আর তারপরেই অনেক সময় ঠাঁই ঠাঁই করে মাথা ঠুকতে আরম্ভ করে।

বাবার কথা মনে হতেই বীরু আস্তে আস্তে মাথা ঠোকে। দেবী আর পারো বড় বড় চোখ করে ওর দিকে তাকায়, তাতে ওর ভারি রাগ হয়ে যায়।

এই সময় একজন পুরুষ ও মহিলা ভেতরে ঢোকেন। পারো আর দেবী তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে ওঁদের নমস্কার করে। বীরু হঠাৎ যেন একটু আলাদা হয়ে যায়। ওঁরা দুজনে বসলে দেবী আর পারো হাসিমুখে তাড়াতাড়ি যায় পাশের ঘরে। বীরু একবার একলা পড়ে যায়।

— তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

— চার ক্লাসে।

— কি কি বই পড়?

বীরু কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না।

— তোমাদের মাস্টার মশায়ের নাম কি?

— মাস্টার ফকির মহম্মদ।

— ওঃ!

এই সব প্রশ্ন আর প্রশ্ন করার ধরন — কোনটাই বীরুর ভাল লাগে না। এই মহিলাকে তো আগেও দেখেছে কয়েকবার। প্রথম দর্শনে মনে হয় ভীষণ মোটা। একটু পরে যখন মোটা ভাবটা একটু চোখে সয়ে যায় তখন নজর পড়ে গায়ের রঙের দিকে। প্রথমে যতটা কালো মনে হয়েছিল পরে বোঝা যায় তার চেয়েও অনেক কালো। এখন শুয়ে পড়েছে, কি মোটাই না দেখাচ্ছে। বীরুর পছন্দ হচ্ছে না। মেয়েদের বীরু পছন্দ করে না। বিশেষ করে যে সব মহিলাদের চালচলন অনেকটা ওর মায়ের মতো তাদের তো ও একেবারেই দেখতে পারে না। এই মোটা কালো মহিলার কোথায় মায়ের সঙ্গে মিল আছে সেটা ও ঠিক ধরতে পারছে না।

মহিলার সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, সে এত বড় নয় যে এর স্বামী হতে পারে, আবার এত ছোটও নয় যে এর ছেলে হতে পারে। আর, কে জানে কেন, এই দুটো সম্পর্ক ছাড়া আর তৃতীয় কোনও সম্পর্কের কথা বীরুর মাথাতেই এল না। এ লোকটির রং ফরসা, চুল কোঁকড়া, বেশ লম্বা, গোড়ালি উঁচু করে দাঁড়িয়ে ওপরে হাত উঠালে বোধ হয় ছাদ ছুঁতে পারবে। বসে রয়েছে, তবু এত লম্বা দেখাচ্ছে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মহিলার গায়ে এমন সেঁটে আছে যে বীরুর মোটেই ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে এখনই মহিলার গায়ের ওপর পড়ে যাবে। ওর পেটের সঙ্গে মহিলার পিঠ একেবারে লেপটে রয়েছে। দুজনের ভারে চারপাইটা ঝুলে পড়েছে একেবারে। চোখ দুটো বেড়ালের মতো চকচক করছে, চোখের তারা নীলচে। বেড়ালের মতো চোখ যাদের, তারা খুব চালাক হয়, বীরু এই রকম একটা ধারণা কি করে বা কার কাছ থেকে শুনে হয়েছে, কে জানে।

এখন মহিলা পুরুষটির পিঠে হাত বোলাচ্ছে, আর পুরুষটির হাত মহিলার পিঠে। বীরুর ভাল লাগছে না। কিন্তু ও একদৃষ্টে যেভাবে চেয়ে আছে কেউ দেখলে ভাববে ওর ভালই লাগছে।

বীরু একটু গলা খাঁকারি দেয়, যেন এদের দুজনের মধ্যে এইভাবে একটা আড়াল বা ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায়।

এরা এসেই এমন ঝপ করে বসে পড়েছে চারপাইতে, যেন অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। এদের ভারে বেচারা চারপাই ক্রমশ মেঝেতে গিয়ে ঠেকছে। মহিলা একটু নড়াচড়া করলেই খচমচ আওয়াজ হচ্ছে। এরা আলাদা আলাদা বসছে না কেন? অন্য চারপাইটা তো খালি পড়ে আছে! বীরুর বলতে ইচ্ছে করছে, চারপাইটা এবার ভেঙে যাবে। রাস্তায় পড়ে থাকা মরা কুকুর দেখলেই যেমন বিশ্রী লাগে, এদের দুজনকে একসঙ্গে বসতে দেখেও বীরুর ঠিক সেই রকম বিশ্রী লাগছে, কে জানে কেন! দেবী আর পারো এ ঘরে এলেই পারে ...

— একটু এদিকে এস তো, লোকটি বীরুকে ডাকে।

— ছেড়ে দাও না নরেশ। মহিলা খুব আস্তে বলে।

লোকটির এই ডাক দেওয়া, মহিলার মানা করা, — কোনটাই ভাল লাগে না

বীরুর। ও নিজের জায়গা থেকে নড়ে না। মহিলা এখন চোখ বুজে শুয়ে আছে। তার হাতটা লোকটার কোঁকড়া চুলের মধ্যে ঘুরছে। এটাও বীরুর পছন্দ হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, এরা দুজনে পারোর ঘরে বসে যেন ছোটখাট একটা চুরি করছে! ও নিঃশব্দে উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়, ভাবখানা যেন পারোকে গিয়ে বলে দেবে এই চুরির কথা।

দেবী আর পারো রান্নাঘরেই রয়েছে, কিন্তু আগের মতো গল্প বা গান-টান কিছু করছে না। ওদের মুখে এখন কেমন একটা রহস্যময় গাম্ভীর্য। এখনও যে ওরা একটুও বিরক্ত ঠিক তা নয়, কিন্তু ওদেব মাথায় যেন একটা চিন্তার বোঝা চেপেছে, আর সেই বোঝাটা কি ভাবে সামলাবে সেই ভাবনায় ওরা ব্যস্ত। রান্নাঘরে বেড়াল ঘুরছে। বীরু পায়ের আওয়াজ করে তাড়া দেয় বেড়ালটাকে! দেবী ওকে দেখে বলে, ও মা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে? যা যা ওদের কাছে গিয়ে বোস।

— ওরা কারা?

— আরে বহেনজিকে চিনিস না? আমাদের বাড়িতেও তো কতবার এসেছে। ওই তো লাহোরে থাকে। ... আরে বাবা যাকে মা পুতনা রাক্ষুসি বলে না?

তখনই বীরুর মনে পড়ে যায় মহিলার সব কটা নাম। ওর আসল নামটা, মা ওকে যেগুলো দিয়েছে— সব। মা ওকে পুতনা ছাড়াও বলে কালো কিষ্টি, বগলা-ভগত, মুটকি, মিঠে ছুরি। ফপফেকুট্টনও বলে।

— আর ওর সঙ্গে ওই লোকটা কে?

— ও একটা লোক। পারো জবাব দেয়।

— ওর কে হয়?

— ওর কে হয় সে কথা ওই জানে। তুমি বরং জিজ্ঞেস কর, তোমার বোনের কে হয়।

দেবী লজ্জা পায়, পারো হাসতে থাকে। বীরু কিছু বুঝতেই পারে না। ওর কৌতূহল বেড়ে ওঠে।

— বল না ও কে? না হলে মা এলে সব বলে দেব মাকে!

— কি বলে দিবি?

— সব কিছু।

— বলে দিস। ততদিন ও এখানে থাকলে তো? ও তো এবার উড়ল বলে!

— কোথায়?

— ওই লোকটির সঙ্গে?

— দেবী? ওই লোকটার সঙ্গে?

দেবী কাঁদো কাঁদো মুখে চেয়ে থাকে পারোর দিকে। বীরু খুব রেগে গিয়ে দেবীকে দেখে। তারপর পারোর কথাগুলো বোঝবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ওদেব দুজনের ওপরেই বিরক্ত হয়ে আবার সেই ঘরে ফিরে যায়। এখন ওরা পাশাপাশি শুয়ে পড়েছে, ওর উপস্থিতি তাই টের পায় না। ও দু'এক মুহূর্ত চুপচাপ

ওদের দিকে দেখতে থাকে, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে যায় রান্নাঘরে, এখনই যেন ওদের নামে নালিশ করবে। কিন্তু রান্নাঘরে পৌঁছে বুঝতে পারে না কি বলবে, কেমন করেই বা বলবে। আদৌ কিছু বলতে চাইছে কিনা, ওর নিজের কাছেও তা খুব স্পষ্ট নয়। দেবী আর পারো আবার কি সমস্যা নিয়ে পড়েছে কে জানে, ওরা টেরই পায় না, বীরু আবার রান্নাঘরে এসেছে। বীরুর ইচ্ছে করে, খুব জোরে চেঁচিয়ে ওঠে কিংবা কিছু তুলে আছড়ে মারে মেঝেতে। মনের এই উদ্বেগ, উত্তেজনা প্রাণপণে চেপে রাখতে গিয়ে চোখ ফেটে জল আসে, — ও বেরিয়ে পড়ে বাইরে।

রাস্তায় বাচ্চারা খেলছে, ওদের খেলা দেখতে দেখতে বাড়ির ভেতরের ব্যাপারটা ভুলে যাওয়া কিছুটা সহজ হল। ও হাঁটা দিল আসলামের বাড়ির দিকে। স্কুল ছুটি হওয়ার পর থেকে একবারও আসলামের সঙ্গে দেখা হয়নি। এরপর মা ফিরে এলে তো আর ওর বাড়ি যাওয়াই যাবে না। মুসলমানদের মা দেখতে পারে না। মা'র মতে মুসলমানরা খুব খারাপ। কিন্তু বীরুর খুব ভাল লাগে মুসলমানদের। হিন্দু ছেলেদের গা থেকে ঘিয়ের গন্ধ আসে আর মুসলমান ছেলেদের গা থেকে আসে ঘামের গন্ধ। কে জানে কেন, ঘিয়ের গন্ধ ঘেন্না করে বীরুর, ঘামের গন্ধ ওর ভারি পছন্দ।

কিছু দূরে এসেই খেয়াল হয় দেবীকে বলে আসা উচিত ছিল, ও আসলামের বাড়ি যাচ্ছে। কিন্তু আবার একটু খুশিও হল মনে মনে, বেশ হবে, দেবী খুব চিন্তায় পড়বে, ওকে খুঁজে বেড়াবে। ভাবুক একটু। আসলামের বাড়ির দিকে ও জোর কদমে হাঁটতে শুরু করে। আজ ও সন্ধে পর্যন্ত আসলামদের বাড়িতেই থাকবে। আসলাম বলছিল, ওর বোন হাফিজা এসেছে লাহোর থেকে। তার কাছে লাহোরের গল্প শুনবে। চুলোয় যাক দেবী আর পারো।

নিজের বাড়ির উঠোনে ল্যাঙট পরে দাঁড়িয়ে আসলাম মালিশ করছিল। বীরুকে দেখে বলল, মালিশ করবি? বীরু মাথা নাড়ে। আসলাম ওকে মালিশের উপকারিতা বোঝাতে থাকে। বীরু কেবল মুচকি মুচকি হাসে। আসলামের বোনের কথা জানতে ইচ্ছে করছে। আসলামের মাকে তো ও আগেই একবার দেখেছে। আসলাম ওকে নিজের বাহুর পেশীতে যে মাছের মতো ঢেউ খেলে যাচ্ছে তাই দেখাচ্ছিল। ওর তেল মাখা শরীরটা চকচক করছে। এখনই ও পঁচিশটা ডন দিয়েছে। ও বীরুকে বলল, লেখাপড়া করে কিছু হয় না, আসল জিনিস হচ্ছে স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যের জন্যে মালিশ খুব দরকারি।

— আসলাম, তোমার বোন চলে গেছে?

— না না, এখনই আলাপ করিয়ে দেব। ও স্নানে গেছে। আমার সঙ্গে কুস্তি লড়বি?

— না বাবা।

— আচ্ছা, তুই বোস তাহলে। আমি স্নান করে নিই। তারপর তাস খেলব।

বীরু তাস খেলতে জানে না। আজ শিখে নেবে আসলামের কাছে। মা যদি

টের পায় তো মাথা ঠুকে ঠুকে বলবে, যেমন বাপ, তেমনি ব্যাটা। কিন্তু মা জানতেই পারবে না। আসলামের বাড়ি ওদের বাড়ি থেকে বহুদূরে, তাছাড়া মা কবে আসবে তারও ঠিক নেই। যদি একদম না আসে তো কি ভালই না হয়! মা চলে গেছে বলে দেবীও কত খোশমেজাজে আছে! পারো বলছিল, দেবী নাকি মা ফিরে আসার আগেই ওই লোকটার সঙ্গে উড়ে যাবে। লোকটা কে? যেই হোক না কেন, দেবী ওর সঙ্গে উড়ে যেতেই পারে না। ও রকম ওড়া যায় নাকি? দেবী যদি ওড়ে তো বীরুও তার সঙ্গে উড়ে যাবে। তারপর মা এসে খুঁজে বেড়াক। ওরা দুজনে তখন মায়ের মাথার ওপর খোলা আকাশে উড়তে উড়তে মায়ের চিৎকার আর ডাকাডাকি শুনবে। এমন মজার ব্যাপারটা কল্পনা করে বীরু হেসে ফেলে।

— আম্মা, রাস্তা থেকে সরে যাও! আসলাম আসছেন! অন্দরমহল থেকে আসলামের মায়ের হাসির শব্দ শোনা গেল। তাই শুনে বীরুর মনে পড়ল মায়ের কান্নার শব্দ।

একটু পরে আসলামের মা বাইরে এসে বীরুকে একলা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বললেন, — তুমি অন্দরে এসে বোস বাবা। আসলাম নাইতে বড্ড দেরি লাগায়, হাফিজার স্নান হয়ে গেছে, তুমি ওর কাছে বোস ততক্ষণ।

বীরু এমন সস্নেহ আমন্ত্রণ শুনে একেবারে গলে গেল।

— আম্মা, কে এসেছে? হাফিজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে প্রশ্ন করে।

— অসলুর বন্ধু বীরু।

— মা, ফের তুমি আমাকে অসলু বলছ? স্নানঘর থেকে মাথা বের করে বলে ওঠে আসলাম। হাফিজা আর বীরু দুজনেই হেসে ফেলে, আসলাম সেই হাসিকে ভেংচি কেটে দরজা বন্ধ করে দেয়। হাফিজা বলে, অসলুটা ভারি বজ্জাত! বীরুর লজ্জা করছে, ঘরে ওরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। হাফিজা বেশ বড়সড় মেয়ে, বেশ সুগঠিত ভরাট দেহ। বীরু একদিন দেবীকে স্নান করতে দেখে ফেলেছিল। হাফিজাকে দেখেই ওর সেই দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল।

হাফিজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বীরুর দিকে ফিরে দাঁড়ায়, লম্বায় সে দেবীর চেয়ে একটু ছোট। কিন্তু ওর গায়ের রং অনেক সুন্দর। দেবীর রং কেমন যেন হলদেটে। হাফিজার রংটা, মাটির বাসন পুড়িয়ে নিলে যেমন গোলাপী দেখায়, সেই রকম। হিন্দুরা কেবল ডাল খায় তাই তাদের গায়ের রং ফ্যাকাশে। এই নিয়ে আসলাম একবার অনেক কথা বলেছিল। হাফিজা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে চিরুনিসুদ্ধ হাতখানা যখন ওপরে তুলে পেছন দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখনই টান পড়ছে কামিজে, বীরু ওর বুকের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছে না।

— আচ্ছা ফিজ্জো, কতক্ষণে তোর সাজগোজ শেষ হবে বলতে পারিস? গা মুছতে মুছতে গোসলখানা থেকে বেরিয়ে আসে আসলাম। হাফিজা তার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসে, আর বীরুরও দাঁতের পাটি জুড়ে যায়।

— আমাদের জন্যে কিছু খাবারদাবার আন, না হলে আমরা এবার তোকেই খেয়ে ফেলব।

হাফিজা চলে যায় হাসতে হাসতে। হাফিজার সম্বন্ধে অনেক কথাই জানতে ইচ্ছা করছে বীরুর, কিন্তু ওর নামটা উচ্চারণ করতেও কেমন লজ্জা লাগছে। কিছুই যে জানা গেল না তাই। লাহোর সম্বন্ধে কত রকম কথা শুনেছে সে। হাফিজা হয়তো নিজে থেকেই ওকে লাহোরের গল্প কিছু কিছু বলতে পারে।

একখানা রেকাবিতে কিছু মাংস, আর একখানা রেকাবিতে দু'তিনটে বড় বড় রুটি নিয়ে ফিরে আসে হাফিজা। ওদের মা-ও এসে দাঁড়ান সেখানে। দুজনেই বীরুর দিকে তাকাচ্ছেন — বীরু বোঝে, ওরা দেখতে চাইছে বীরু ওদের বাড়ির রুটি খাবে কি না! বীরুর এদিকে খুব খিদে পেয়েছে। রেকাবি থেকে গরম ভাপ আর সুগন্ধ উঠছে, তাতে খিদেটা আরও জোরদার হয়ে ওঠে। মায়ের সব রকম নিষেধাজ্ঞা ভুলে, বীরু বিনা দ্বিধায় আসলামের সঙ্গে খেতে শুরু করে। হাত ধোয়ার কথাও মনে থাকে না। হাফিজাও বসে ওদের সঙ্গে। আসলাম বলে—আম্মা, তুমিও বস না? কিন্তু আম্মা বলেন –– না, তোমরা খেয়ে নাও। যদি বাঁচে কিছু, তখন না হয় খাব। এ কথায় সবাই খুব হেসে ওঠে। বীরুর মুখ জ্বলছে ঝালের চোটে, কিন্তু এমন চমৎকার রান্না ওর নিজের বাড়িতে কখনও খায়নি।

খেতে খেতে আসলাম আবার গান গাইছে মাঝে মাঝে —

মুহম্মদ ন হোতে, খুদাঈ ন হোতী
খুদা নে য়হ দুনিয়া বনায়ী ন হোতী
জমাঅত মেঁ মেরি পিটাই ন হোতী
ফিজ্জো কে সির পে রজাই ন হোতী
খুদা নে যে অম্মা বনায়ী ন হোতী
মুহম্মদ ন হোতে, খুদাঈ ন হোতী

আসলামের মা এই রকম গান শুনে রাগ করে বলেন — তোর লজ্জা করে না অসলু? খুদা আর রসুলকে নিয়ে হাসি ঠাট্টা করা কি উচিত? কত পাপ যে তোর হচ্ছে! কবে যে তোর আক্কেল বুদ্ধি হবে কে জানে।

আসলাম চট করে জবাব দেয়, — জানো মা, আমি একদিন খুব ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সেই সময় এই ফিজ্জোটা আমার সব বুদ্ধি চুরি করে নিয়েছে। ও বেচারার নিজের তো কিছুই ছিল না কি না!

হাফিজা হাসতে হাসতে বীরুকে বলে, — কি রে, তুইও কি তোর বোনকে এমনি জ্বালাতন করিস?

বীরু চুপ করে থাকে। ওর নিজের মা আর বোনের সম্বন্ধে ও চুপ করেই থাকতে চায়। ওদের সম্বন্ধে কোনও কথা শুনতে চায় না ও।

কিন্তু আসলামের মা বলেছেন, — বীরু বাবা, তোর মায়ের সঙ্গে একদিন

আলাপ করিয়ে দে না। ওঁকে তুই আমাদের বাড়িতে নিয়ে আয়, আর নয়তো আমাকেই একদিন নিয়ে চল তোদের বাড়ি।

বীরুর এই দুটো কথার কোনটাই পছন্দ নয়। কিন্তু সেকথা ও বলে কি করে? তাই চুপ করেই থাকে। মায়ের নাম শুনেই ওর ভাবনা চিন্তা যেন দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গেছে — সেই বিভাজনের ছায়া ওর মুখের চেহারায় স্পষ্ট ফুটে ওঠে।

— আরে বাবা, খাওয়া বন্ধ করলি কেন?

— ব্যাস, পেট ভরে গেছে আমার।

— এর যে দেখি একেবারে পাখির আহার।

— অসলু, তোর বন্ধুকে দেখে একটু শেখ।

হাফিজাও খাওয়া শেষ করেছে। বীরু এখন আর তার দিকে তাকাচ্ছে না, তার বদলে এখন মাথা নিচু করে ভাবছে নিজের বাড়ির কথা। বাবা আর মা হয়তো ফিরে এসেছে। আসলামের খাওয়া শেষ হলেই ও বাড়ি ফিরে যাবে।

— অসলু, তোর বন্ধু তো আজ মুসলমান হয়ে গেল!

— দেখ হাফিজা, ওর মা যদি টের পেয়ে যান তো আমাদের বাড়ি আসা যাওয়া ওর বন্ধ হয়ে যাবে।

— আমার মা এখন এখানে নেই।

— কোথায় গেছেন?

— যেখানে দাদী থাকে।

— তোর দাদী এখনও বেঁচে আছেন?

— না, মারা গেছেন। সেই জন্যেই তো গেছে মা। বাবাও সঙ্গে গেছে।

— তোরা আব্বাকে বুঝি বাবা বলিস?— হ্যাঁ।

— আমরা তো ঠাকুর্দাকে বাবা বলি।

আসলামের খাওয়া শেষ হয়েছে।

— আচ্ছা, আমি এবার যাই।

— তাস খেলবি না?

— আমি তাস খেলতে জানি না।

— আরে বাঃ, তাহলে কি জানিস তুই শুনি? কি রে হাফিজা, তুই ওকে তাস খেলা শেখাবি?

— ছেড়ে দে না বেচারাকে। ওর মা হয়তো ওর জন্যে বসে রয়েছেন।

আসলামের আম্মা, কে জানে কেন, প্রতি কথায় মায়ের প্রসঙ্গ তুলছেন।

— ওর মা এখন নেই এখানে, এখনই তো বলল, তাই না বীরু?

— হ্যাঁ, কিন্তু বোন তো এখানেই আছে।

— ও, তুই বোনকেও বুঝি খুব ভয় পাস?

— পায়ই তো, সবাই তো তোর মতো বেহায়া নয় যে বড় বোনকেও ভয় করবে না?

— আচ্ছা, আমি চলি এখন।

— চল, তোকে পৌঁছে দিই।

— না না, আমি একলাই যেতে পারব। বীরু নিজের বাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যেতে চায় না আসলামকে। কে জানে, ওদিকে মা এসে বসে আছে কিনা!

বাড়ির পথে চলতে চলতে ও ভাবছিল আসলাম, তার মা, তার বোন, ওদের বাড়ি, ওদের সকলের কথা। ভাবতে ভাবতে নিজের মা, বোন, নিজেদের বাড়ির সঙ্গে তুলনাটা আপনা থেকেই মনে এসে যাচ্ছিল। দুটোর মাঝখানে একটা দাঁড়ি টেনে রাখছিল মনে মনে, ওর মুখের চেহারা আরও ম্লান হয়ে উঠছিল। আসলাম আমার চেয়ে কত বেশি লম্বা! হাতগুলো কেমন মোটাসোটা। সব সময় হাসে, আমার চেয়ে কত বেশি খায়। বোনের সঙ্গে কত হাসিঠাট্টা করে। ওর জামাকাপড় কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! আসলামের মা কি সুন্দর! যখন হাসেন কি মিষ্টি লাগে দেখতে! আমার মায়ের কাপড় তো সব সময়ই নোংরা, সব সময়ই সালোয়ারের দড়ি লুটোচ্ছে, রুক্ষ চুল উসকো খুসকো উড়ছে। যেমন কথা, তেমনই হাতগুলো, দুটোই খরখরে। গাল তুবড়ে গেছে, দাঁতের পাটির মাঝে মাঝে দাঁত পড়ে ফোকলা। মুখে তো সব সময় তুবড়ি ফুটছে। সকলের সঙ্গে ঝগড়া! আর আসলামদের বাড়ি? আসলামের বোন হাফিজা! হাফিজা অনেকটা পারোর মতো। দেবীর চেহারা তো মায়ের মতো, স্বভাবের দিক থেকেও খুব তফাৎ নেই। বাবার রাগ হলেই বলে, তোমাদের দুজনের হাত থেকে এক ভগবানই বাঁচাতে পারে! আসলামের আব্বা এখানে থাকেন না। চারপাইতে বসে বাবা যখন ঝুঁকে পড়ে কাগজপত্র দেখে তখন বাবার চশমাটা নাকের ওপর এমন ভাবে ঝোলে, যে মনে হয় এই বুঝি পড়ে গেল! চশমার একটা ডাঁটি তো সদাই ভাঙা। দাড়ি খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে, মনে হয়, মুখের ওপরে বাবা একখানা কাঁটা ভরা মুখোশ পরে বসে আছে। পায়ের আঙুলগুলোয় মোটা মোটা কড়া, বাবা কি করে যে হাঁটে কে জানে! বাবার মাথাটা আবার বেজায় বড়, তাই বোধ হয় কেবলই মাথা ঠোকে যখন তখন। যে কোনও মুহূর্তে কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে গর্জন শুরু করে দিতে পারে।

বাড়ির দিকে চলতে চলতে বীরুর মনে নিজেদের বাড়ির প্রতিটি জিনিস সম্বন্ধে ঘেন্না বেড়ে চলে। মনের মধ্যে থেকে উপচে ওঠা রাগটাকে ও যেন বড় বড় দলা পাকিয়ে গিলে ফেলতে চেষ্টা করছে, হাতের মুঠো ক্রমাগত খোলে আর বন্ধ করে, চোখ দিয়ে যেন রাগের স্ফুলিঙ্গ ঠিকরে পড়ছে — এই ভাবে শেষ পর্যন্ত এসে দাঁড়ায় বাড়ির দরজায়।

দরজা বন্ধ। বাব-মা তাহলে ফেরেনি এখনও। দেবী নিশ্চয় এখনও পারোর বাড়িতেই বসে আছে। কিন্তু ওর এখন পারোর বাড়িও আর ভাল লাগে না। কি যে ওর ভাল লাগে তা ও নিজেও বুঝতে পারে না। কিন্তু এটুকু বোঝে, কোথাও নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু আছে যা পেলে ওর সব দুঃখ ঘুচে যাবে। কিন্তু কি সে জিনিস, কোথায় আছে, কেমন করে তা পাওয়া যাবে — এসব ওর জানা নেই।

কয়েকটা ছেলে কাছে এসে দাঁড়ায়। ও চুপ করে থাকে। ছেলেগুলো কিছুক্ষণ ওর আশেপাশে ঘোরাফেরা করে যেন কিছু তামাশা দেখছে। ও বসে থাকে একেবারে নির্লিপ্ত ভাবে। ও কাউকে পরোয়া করে না।

শেষ পর্যন্ত এই নীরবতা ভাঙতেই একটা ছেলে প্রশ্ন করে, — বীরু, তোর মা কোথায় গেল রে?

— দাদীর বাড়ি।

— তোর দাদী তো মারা গেছে, তাই না?

— হ্যাঁ।

— তাহলে আয়, একটা নতুন খেলা খেলব। তুই কাঁদতে থাক, আমরা তোকে চুপ করাব। বেশ মজা হবে।

ছেলেদের এই পরিকল্পনা বীরুর খারাপ লাগে না, ওরা বন্ধুর মতোই ব্যবহার করছে। বীরু রাজি হয়ে যায়। তারপর মুখ বিকৃত করে কান্নার অভিনয় করে।

— কেন কাঁদছ ভাই? কেঁদে কি হবে?

— কাঁদলে কি কেউ ফিরে আসে?

— ধৈর্য ধর ভাই, কেঁদে তো কোনও লাভ হয় না।

— আরে ইয়ার, কেঁদে কেঁদে নিজের প্রাণটাই খোয়াবে নাকি তুমি? একটু শান্ত হও ভাই।

— নিয়তি বড়ই শক্তিশালী।

— কারও জোর খাটে না তার ওপর।

— নানক দুখিয়া সব সংসার।

— একদিন তো সবাইকেই যেতে হবে।

— বেচারার দাদী একেবারে হঠাৎই চলে গেলেন।

— বড় আচমকা শেষ নিঃশ্বাস পড়ল।

— বড় ভাল মানুষটা ছিলেন।

— তা ছিলেন। কিন্তু মৃত্যু তো কাউকে খাতির করে না।

— একদিন না একদিন তো আমাদের সবাইকেই যেতে হবে।

— তাই তো এ বেচারাকে বলছি, এবার চুপ কর।

— চুপ কর ভাই, যা হওয়ার ছিল, তা তো হয়েই গেছে।

— কি করে বেচারা! এর তো মা থেকেও নেই।

— সে আবার কি?

— একে তো ভাই, সব সময় ধমকায় আর ঠ্যাঙায়। এর বাবার সঙ্গে কেবল ঝগড়া করে, এর বোনকে সব সময় গালাগাল দেয়। বেচারার যা ওই এক দাদী ছিল, তাকেও ভগবান নিয়ে নিলেন। এ বেচারা তো একেবারে অনাথ হয়ে গেল। তাই নয় কি?

— হ্যাঁ, তা তো হলই। সব ছেলে একসঙ্গে বলে ওঠে।

— জীবনের কোনও ভরসা নেই

— নিয়তির হাতের পুতুল রে ভাই...

এবার সবাই সশব্দে হেসে ওঠে। খেলাটা খুব জমেছে। কিন্তু এই মরেছে, বীরু যে সত্যি সত্যি কাঁদতে শুরু করল! ছেলেরা ঘাবড়ে গেল এবার।

— এ যে সত্যি সত্যি কাঁদছে।

— কাঁদছে কাঁদুক, কি এমন বলেছি আমরা?

— এটা একটা বুদ্ধু!

— আরে শালা, সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলবি যদি তো রাজি হলি কেন খেলতে?

— এখন ওর বোন যদি এসে পড়ে?

— আসুক না, কি করবে সে আমাদের?

এরপর ওরা সবাই এই নিয়ে হাসাহাসি করতে থাকে, আর বীরু ওদের গালাগাল দিতে শুরু করে।

— মার শালাকে।

— ধরে একেবারে পুঁতে ফেল।

— মেরে একদম ছাতু করে দে।

সবাই চেঁচাচ্ছে কিন্তু এগোচ্ছে না কেউ। আসলে ওরা কেউই এখন লড়াই করতে চায় না। তার কারণ এই নয় যে, ওরা ওকে, বা ওর মাকে ভয় পায়। আসলে মারপিট করার চেয়ে এইভাবে বীরুকে কষ্ট দেওয়াটা ওদের কাছে অনেক বেশি মজার বলে মনে হচ্ছে।

— বেশ হয়েছে, খোকাবাবুর দাদী মরে গেছে।

— আমাদের সঙ্গে ঝগড়া করলে একদিন ওর মা-ও মরে যাবে।

— যা, যা, মাকে ডেকে নিয়ে আয় গে।

— যা মায়ের কোলের মধ্যে ঢুকে পড়।

— এই পালা, ওই দেখ হারামিটার বোন আসছে। দৌড়া!

ছেলেগুলো ছুটে পালায়। দেবীকে কাছে আসতে দেখে বীরু এবার গলা ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

— বীরু, কি হয়েছে রে? তুই কোথায় গিয়েছিলি? সারাদিন কোথায় যে ঘুরিস! কাঁদছিসই বা কেন? কি হয়েছে বল্ না কেউ মেরেছে?

দেবীকে সরিয়ে দিয়ে পারো বীরুকে কোলে তুলে নিতে চেষ্টা করে। পারোর উষ্ণ নরম দেহের ছোঁয়ায় যদিও বীরুর কান্না থামে না, কিন্তু মনটা বেশ শান্তিতে ভরে যায়।

তেরো

একদিন রাত্রে ও আর দেবী পারোর বাড়িতে শুতে গেল। ও শুয়েছে পারোর কাছে। বহুক্ষণ পর্যন্ত ওর ঘুম আসে না। ঘুম আসে না পারো আর দেবীরও। ওরা দুজনে কি যে এত গল্প করেই চলেছে কে জানে। ও দু'চোখ বন্ধ করে পারোর গায়ের সঙ্গে সেঁটে শুয়ে আছে। মাঝে মাঝে পারো ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চুমো খাচ্ছে, তখন ওর দুটো চোখ যেন আবেশে ভারী হয়ে আসছে। কিন্তু তারপরেই ও আবার সজাগ হয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছে।

— পারো, মাকে কথাটা কে জানাবে?

— তোমাকেই বলতে হবে।

— আমাকে তো তাহলে খুন করে ফেলবে।

— তাহলে বহেনজিকে বল।

— বহেনজি তো মাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না।

— কিন্তু সে তোর বাবার সঙ্গে তো কথা বলতে পারে?

— সে তো তুমিও বলতে পারো।

— বেশ তো, তবে আর চিন্তা কি?

— আসল ভয় তো মাকে নিয়েই। শুনলেই একদম ক্ষেপে যাবে। পারো, এইসব ভেবে ভয়ে আমার প্রাণ একেবারে শুকিয়ে যাচ্ছে।

— এতই যদি তোর দুর্বল মন, তাহলে আগেই ভাবা উচিত ছিল।

— পারো, এখন আমার মনে হচ্ছে কেন এই ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে বসলাম।

— ঝঞ্ঝাট? বেশ আজব কথা বলছিস যা হোক! সেদিন তো দেখেই এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলি, আমি বাধা না দিলে বোধ হয় সবার সামনেই ওর গলা জড়িয়ে ধরতিস।

— সেদিন যে আমার কি হয়েছিল কি জানি! কিন্তু এখন আর আমার সে রকমটা লাগছে না। মাইরি বলছি।

এরা দুজনে বোধ হয় সেই লোকটার কথা বলছে। বীরু একটু ভয় পেয়ে যায়। ওর চোখের সামনে এখন মায়ের মুর্তিটা।

— চুলগুলো কি সুন্দর দেখেছিলি?

— আর চোখ দুটো?

— নাকটিও কি দারুণ!

— কি ফরসা রং!

— এত সুন্দর গান গায়! গলা শুনলে যেন মরে যেতে ইচ্ছে করে।

— উঃ ওই গলা শুনেই সবাই মরেছে। তুই যে আগেই পছন্দ করে ফেললি, না হলে আমিই কি ছেড়ে দিতাম নাকি?

— তা এখন তোকে কে আটকাচ্ছে শুনি?

— আরে না না, ঘাবড়াস না, আমি তো ঠাট্টা করছিলাম কি রকম লম্বা দেখেছিস? তোর তো দফা শেষ করে দেবে!

— থাম, অসভ্য কোথাকার!

— সত্যি বলছি।

— তোর এত নাল পড়ছে কেন বল তো? তোর ভাগ্যে দেখিস এর চেয়েও কত ভাল জুটবে!

— আচ্ছা, খুব হয়েছে, এখন থাম তো!

পারো দেবীর কানে কানে কি যেন বলে, বীরু শুনতে পায় না। কিন্তু এদের দুজনের কথাবার্তা এখন কিছুটা বুঝতে পারছে ও। আর এইসব শুনতে বেশ ভালও লাগছে।

— একটা কথা বলব, কিছু মনে করবি না তো? সত্যি বলছি, এই রকম একটা মানুষের জন্যে যদি বাপ মাকে ছাড়তে হয় তাহলেও কোনও দ্বিধা করা উচিত নয়।

দেবী এ কথার কোনও উত্তর দেয় না। একটু চুপ করে থেকে বলে — মায়ের ব্যাপারে আমার মনটা যে কি খিচঁড়ে উঠেছে, সে একমাত্র আমিই জানি।

— এখন আর চিন্তা করছিস কেন, আর তো অল্প ক'টা দিন।

— তোর তো সব দিক থেকেই পছন্দ হয়েছে?

— পছন্দ? তোর আবার হিংসে হবে, না হলে আরও কত কিছু বলতাম।

দেবী আবার চুপ করে যায়। বীরু পাশ ফিরে শোয়।

— ও মা, তুই এখনও ঘুমোসনি বীরু?

— না।

— বদমাস কোথাকার! আমাদের কথা শুনছিলি না তো?

— শুনছি তো।

— শুনুক না, ও আর কি বুঝবে?

— আমি সব বুঝতে পারছি। বলব?

— না বাবা থাক। তুমি এখন দয়া করে ঘুমোও। ... আচ্ছা দেবী, তুইও এবার ঘুমিয়ে পড়। মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখবি।

— তোর মুণ্ডু দেখব।

দুজনেই হেসে ওঠে। পারো বীরুকে জড়িয়ে ধরে খুব আদর করে। বীরুর চোখ জড়িয়ে আসে আবেশে। ওর মনে হয়, এই প্রথম যেন ও মায়ের আদর খাচ্ছে। অবশ্য অন্ধকারের মধ্যেও ও বেশ অনুভব করছে মা আর পারোর মধ্যে কতখানি তফাৎ।

— পারো, ওর মাথাটা একটু চুলকে দে, তাহলে এখনই ঘুমিয়ে পড়বে।

— এর কথা তোকে ভাবতে হবে না। তুই যাতে একটু আরামে ঘুমোতে পারিস তার জন্যে কি করব বল।

দেবী হেসে ফেলে। বীরু ভাবে, রোজ যদি পারোর কাছে শুয়ে ঘুমোতে পেতাম তো কি ভালই না হত।

— শোন পারো, একটা ব্যাপারে কিন্তু আমার মনে একটু খটকা লেগেছে।

— ফের ওই এক কথা? ওরে বাবা, অনেক হয়েছে এবার অন্য কিছু বল।

— আচ্ছা, তুই কি লক্ষ্য করেছিস বহেনজি ওর সঙ্গে কেমন লেপটে থাকে?

— তাতে কি হয়েছে? ওরই তো ছেলে।

— কিন্তু নিজের পেটের ছেলের সঙ্গেও কোনও মা কি এভাবে সেঁটে থাকে, বিশেষ করে ছেলে যখন বড় হয়েছে?

— তোর মাথায় এখন এই আবার এক নতুন চিন্তা ঢুকল দেখছি। আরে বাবা, বিয়ের পর তো তুইই লেপটে থাকবি ওর সঙ্গে। ততদিন পর্যন্ত বুড়িটাকে লেপটে থাকতে দে না!

— কিন্তু পারো, বহেনজিকে কি কেউ বুড়ি বলবে?

— তবে কি ও যুবতী নাকি?

— যুবতী না হোক, বুড়িও নয় কিন্তু। একটু ভেবে দেখ ভাই কথাটা।

— আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে, ভাবতে থাক।

— সত্যি বলছি, শেষকালে এমন না হয় যে ... দেবী উঠে গিয়ে শোয় পারোর পাশে। বীরু ওদের দুজনের মাঝখানে। কিন্তু ওর ঘুম এসে গেছে। ধীরে পড়ছে শ্বাসপ্রশ্বাস।

একটু পরেই কিন্তু বীরুর ঘুমটা আবার ভেঙে যায়। এখন ও একলা শুয়ে

আছে। পারো উঠে গেছে দেবীর চারপাইতে। ওরা এখনও কথা বলে চলেছে।

— আচ্ছা, যা হবে তখন দেখা যাবে।

— হয়তো এতে খারাপ কিছুই নেই।

— হ্যাঁ, তা তো হতেই পারে, কিন্তু পারো, কিছু গোলমেলে ব্যাপার আছে নিশ্চয়, না হলে আসল মায়ের সঙ্গেও ছেলের এত ভালবাসা কমই দেখা যায়। আর যদি ভালবাসা থাকেও তবু এত বড় ছেলেকে মা কখনও কোলের মধ্যে নিয়ে বসে থাকে?

— সে তো ঠিক কথাই। কিন্তু এটাও ভেবে দেখ, যদি কোনও গোলমাল থাকত, তাহলে কি বহেনজি ওর বিয়ে দিতে রাজি হত?

— যাক গে, ছেড়ে দে। আমার সন্দেহের কথাটা তোকে তো জানিয়ে দিলাম। এখন ভগবানের যা ইচ্ছে, তাই হবে। দেখা যাক কি হয়।

পারো উঠে এসে শোয় বীরুর পাশে, আর ও আবার চোখ বুজে ফেলে।

দুপুর বেলা। সারাটা গলি নিঝুম। চাঁদি ফাটানো রোদ্দুরের মধ্যে ওরা যে কোথায় চলেছে কে জানে। দেবী আর পারোর সঙ্গে আসার জন্যে ও কেন যে জেদ ধরেছিল, সে কথা ভেবে বীরুর এখন আফসোস হচ্ছে। আরাম করে বাড়িতে বসে থাকলেই হত, কিন্তু একা একা বাড়িতেই বা কি করে? ছেলেগুলো তো সেইদিন থেকে ওকে দেখলেই পিছনে লাগে, চেঁচাতে থাকে! 'হায় দাদী। হায় দাদী!' মা সেই যে গেছে আর ফেরার নামটি নেই। কোথায় কোন্ কুয়োতে গিয়ে ডুবেছে কে জানে। গিয়ে পর্যন্ত একটা চিঠিও লেখেনি।

আজকাল দেবী আর পারোর ওপরেও ওর রাগ ধরে গেছে। ওদের মুখে কেবল নরেশের গল্প! পারো বড় বেশি কথা বলে, সব সময় বকর বকর। আসলামের বোন হাফিজা কত কম কথা বলে। কিন্তু সে তো লাহোর ফিরে গেছে। আসলামের সঙ্গে বীরুও স্টেশনে গিয়েছিল হাফিজাকে বিদায় দিতে। যাওয়ার আগে হাফিজা ওকে বলেছে, 'লাহোরে আসছ তো?' ও বলেছিল, হ্যাঁ। সেদিন আসলাম কে জানে কেন বীরুর ওপর চটে গিয়েছিল, ফেরার পথে বীরুর সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। হাফিজা চলে যাওয়ার পর বীরু আর যায়নি আসলামদের বাড়ি। আজকাল ওর কোথাও যেতে ভাল লাগে না। মা এবার ফিরে এলেই পারে!

কিন্তু মা ফিরলেই তো বাড়িতে আবার সব সময় হুলুস্থুল চলতে থাকবে। তা হোকগে যাক। আর এতদিন পরে মা হয়তো ঝগড়া করতে ভুলে গেছে। ও নিজেই তো মায়ের চেহারাটা প্রায় ভুলতে বসেছে। খোকাটা এতদিনে কত বড় হয়ে গেল কে জানে। একদিন রাতে ও স্বপ্ন দেখেছিল খোকা মারা গেছে আর মা তাকে কোলে নিয়ে কাঁদছে। এই স্বপ্নটার কথা ও দেবীকে বলেনি।

কাল জলালপুরণী বলছিল, তোর মা গিয়ে পর্যন্ত দেবী একেবারে যা খুশি করে বেড়াচ্ছে। আমি সব খবর রাখি। তোর মা এলে সব বলে দেব।

বীরু বাড়ি ফিরে কথাটা দেবীকে জানিয়েছিল। কিন্তু দেবী তখন অন্য চিন্তায় মগ্ন, সে শুধু বলল, 'দেখা যাবে'।

নিজেদের পাড়া থেকে অনেক দূরে একটা বাগানের পাঁচিলের ধার দিয়ে এখন ওরা হাঁটছে। দেবী বলছে, ও কুল খুব ভালবাসে। পারো শুনে হাসছে। পারো তো সব সময়ই হাসে। মাঝে মাঝে একটু চুপ করেও তো থাকা উচিত। পারো বলছে — ওগো রানী, যখন লাহোর চলে যাবে, তখন তো এমনই সব বাগানেই দিন কাটবে।

সামনে বাগানের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে বহেনজি আর নরেশ। ওদের আসতে দেখে তারা দুজনে ভেতরে ঢুকে গেল। দেবী পারোর কানে কানে কিছু বলে। পারো বীরুকে বলে — যা, দৌড়ে গিয়ে ওদের বল আমরা এসে গেছি।

বীরু যেতে রাজি হয় না। একটু পরে ওরা গিয়ে পৌঁছায় বহেনজি আর নরেশের কাছে।

— এত রোদে কি দরকার ছিল আসবার! নাক কুঁচকে বলে বহেনজি।

দেবী আর পারো তাকায় পরস্পরের দিকে, যেন এত রোদে এখানে আসার একটা কারণ খুঁজতে চেষ্টা করছে।

বীরু নরেশকে দেখছে। নরেশ একটা ঢিলে কুর্তা পরে রয়েছে। তার পায়জামার পাগুলো খুব ঢোলা, সারা শহরে কেউ বোধ হয় এত ঢোলা পায়জামা পরে না। ওর হাতে একখানা খাতা। খাতা হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এর কি মাথার ঠিক নেই? এদের সকলের মাথা খারাপ, না হলে পাড়া থেকে এতদূরে এই রকম একটা শুকনো পচা বাগানে এই রোদে কেউ কারও সঙ্গে দেখা করতে আসে?

— এত দেরি করে আসবে যদি তো আমাদের বলেছিলে কেন? বহেনজি বেশ রেগে গেছে মনে হচ্ছে।

দেবী চুপ করে থাকে। পারো হাসবার চেষ্টা করে বলে—কাজ সারতে দেরি হয়ে গেল। কিন্তু বহেনজির মুখের দিকে তাকিয়ে ওর হাসি থেমে যায়। বীরুর মনে হয় দেবী আর পারো নিজেদের ভুলের জন্যে অনুতাপ করছে।

— আসবেই যদি তো এ বেচারাকে কেন নিয়ে এলে?

— ও যে জেদ ধরে বসল। আমরা এত বোঝালাম, কিন্তু কান্না জুড়ে দিল, তাই ভাবলাম ...

— আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। চল এখন, খুব দেরি হয়ে গেছে। কেউ দেখলে কি বলবে আবার, এ তো আর লাহোর নয়। এখানকার লোকে এতটুকু দেখলে, এতখানি করে বলবে।

ওরা এবার ফেরার পথ ধরে, পথে কেউ কোনও কথা বলে না। বহেনজি আর নরেশও চলে যায় নিজেদের বাড়ির দিকে। তারা অন্য পাড়ায় থাকে।

পারো আর দেবী বেশ রেগে রেগে তাকাচ্ছে বীরুর দিকে, যেন ওর জন্যেই সব পণ্ড হল। বীরুর মাথাটা এখন এত গরম হয়ে উঠেছে, ওদের রাগের জন্যে সে এতটুকুও মাথা ঘামাচ্ছে না। বাড়ি গিয়ে অনেক জল খাবে, গলা শুকিয়ে কাঠ। পায়ের তলা জ্বালা করছে।

বাড়ির দরজা খোলা, বীরু আর দেবী চমকে ওঠে। মা এসে গেছে মনে হচ্ছে। তালাটা ভেঙে ঝুলছে দরজার কড়ায়। ওদের দরজার কাছে ছেড়ে রেখে পারো নিঃশব্দে নিজের বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

বীরু তাকায় দেবীর দিকে, যেন জানতে চাইছে এবার কি হবে? দেবী ফ্যাকাশে মুখে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ভেতর থেকে কোনও আওয়াজ আসছে না। শেষ পর্যন্ত দুজনে আস্তে আস্তে এগোয় দরজার দিকে। সামনের রোয়াকেই মা দাঁড়িয়ে, দেখে ওদের সারা শরীরের রক্ত যেন শুকিয়ে যায়।

মায়ের খালি পা, মাথায় কাপড় নেই, জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে, দু'চোখে অগ্নিবর্ষণ করতে করতে দেখছে দুজনকে। মুখখানা ফ্যাকাশে হলদেটে। বীরুর মনে হল, ওখানে গিয়েও মা পেট ভরে খেতে পায়নি!

বীরু ধীরে ধীরে এগোয় মায়ের দিকে। ভাবে, কাছে গেলে হয়তো মায়ের ভাল লাগবে। এতদিন পরে দেখা নিশ্চয়ই ওকে আদর করে চুমো খাবে। হয়তো কেঁদে ফেলবে। মা যদি ওকে জড়িয়ে না ধরে তাহলে কিন্তু ও নিজেই কেঁদে ফেলতে পারে। ওর চোখে জল আসছে, মনের মধ্যেটা আবেগে ফুলে ফুলে উঠছে। কিন্তু মা ওকে দেখছে না, তার বদলে কেবল দেবীকেই দেখছে। মা যেন দেবীর মুখে ক'দিনের সব কথা পড়তে পারছে।

হঠাৎ বীরুর মনে হয় ওর সামনে মা নয়, মায়ের ভূত দাঁড়িয়ে রয়েছে, লম্বা লম্বা দাঁত, মাথায় দুটো শিং, উলটো দিকে পা...

ও চিৎকার করে উঠে মায়ের পা দুটো জাপটে ধরল। একটু পরে যখন ওর মাথার ঘুরুনিটা একটু কমেছে, তখন শুনতে পেল মা আর দেবী দুজনেই কাঁদছে। মা বলছে, —হায় হায়, কেন যে গেলাম ওখানে, কিসের জন্যে গেলাম? আমার অমন সোনার চাঁদ খোকাকে রেখে এলাম ওখানেই-

খোকা ওখানেই রয়ে গেছে এ কথার মানে বুঝতে বীরুর কিছুক্ষণ সময় লাগল। যখন বুঝল তখন প্রথমেই মনে হল বাবার কথা। বাবা কোথায়? বাবাও ওই রকম ভাবে সেখানে থেকে গেছে না কি?

মা কেঁদেই চলেছে ... কোনও উত্তর দিচ্ছে না।

চোদ্দ

বীরুকে কেউ যেন অগ্নিকুণ্ডে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। মা বারবার ওর কপালে হাত রাখছে। তারপর চোখ বুজে হাত জোড় করে কখনও উঁচু কখনও বা নিচু গলায় ভগবানের সঙ্গে কথা বলে চলেছে। বীরু মিটিমিটি চোখে চেয়ে দেখে মায়ের দিকে। মায়ের গলার স্বর ওর জ্বরতপ্ত কানের মধ্যে যেন ঝনঝন করে বেজে উঠছে। মাথার মধ্যে একটা কেমন শূন্যতা, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে। চোখে যেন আগুনের ফুলকি জ্বলছে। হঠাৎ মা ওর মাথার কাছে মেঝেতে বসে পড়ে নাকখত দিতে শুরু করল। তাই দেখে বীরুর কান্না আসে, হাসিও পায়। ওর জন্যে যদি এতই চিন্তা তাহলে কাল রাতে মা ওকে অত মারল কেন? এত মার তো আজ পর্যন্ত কখনও খায়নি। ওর মনে হচ্ছিল, মা ওকে আজ বোধ হয় মেরেই ফেলবে। ভাগ্যে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গিয়েছিল, না হলে মা সত্যিই হয়তো খুন করে ফেলত।

কিন্তু আজ সকাল থেকেই দেখছে, মা কেবলই কিছুক্ষণ পরে পরে এসে কপালে হাত রাখছে, আর পাগলের মতো বলে উঠছে — হায় হায়, আমি যে মহাপাপী! তখন কি যে ভূত চেপেছিল মাথায়! হাত দু'খানা আমার খসে গেল না কেন? আমার জিভ কেন খসে গেল না, এই মুখে আমার বাছাকে কত অকথা কুকথাই না বলেছি!

কথাগুলো শুনতে শুনতে বীরুর রক্ত গরম হয়ে উঠছে রাগে, আবার কিছুটা ভালবাসাতেও বটে। মায়ের রাগ আর ভালবাসা দুটোই যেন পাগলের মতো।

মায়ের নজর এড়িয়ে দেবীও কয়েকবার এসে ওর গালে হাত ঠেকিয়ে জ্বর দেখেছে। দেবীর ওপরেও ওর রাগ হচ্ছে খুব। নিজে তো দিব্যি বেঁচে গেল আর মারটা খেতে হল ওকে। দেবীটা যদি এত বড় না হত তো মায়ের সমস্ত রাগের চোটটা পড়ত তার ওপরেই। বীরুর মাথা ঘুরছে এখনও। ও চোখ বুজে ফেললে মা ভাবে ও বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে। রান্নাঘরে চলে যায় মা। সেখানে দেবীকে বলে — দূর হয়ে যা আমার চোখের সামনে থেকে, ডাইনি কোথাকার! যদি আমার ছেলের কিছু হয় তো দেখে নেব তোকে।

দেবী কোনও জবাব দেয় না। বীরু চোখ মেলে তাকায়। মা যদি আবার দেবীকে কিছু বলতে শুরু করে তো বীরু এবার ঠিক চেঁচিয়ে উঠবে — বকবক বন্ধ কর মা, নাহলে আমার জ্বর আরও বাড়বে।

দেবী রান্নাঘর থেকে উঠে বাইরে চলে যায়। বীরু আবার চোখ বুজে ফেলে। ও দেবীর চোখের দিকে তাকাতে চায় না। দেবী এসে দাঁড়িয়েছে ওর মাথার কাছে।

— ওর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে কি করছিস কি? যা না, বন্ধুদের কারও কাছে দু'চার পয়সা চেয়ে এই আধমরা ছেলেটার জন্যে একটু ওষুধ তো অন্তত আনতে পারিস।

মা ফিরে আসতে না আসতেই সেই পুরনো কাঁদুনি গাওয়া শুরু হয়ে গেছে। পয়সা নেই, আটা নেই, কিছু নেই। যতদিন মা ছিল না, সবই তো থাকত। দেবী কোথা থেকে সব জোগাড় করত কে জানে। বাবা ঠিকই বলে, মায়ের ওই হায়, হায় করার জন্যেই ঘরে কিছু থাকে না। দাদী বলত, তোর মা হচ্ছে অলক্ষ্মীর ঢেঁকি। ও যখন খুব ছোট, তখন মা প্রায়ই একটা গল্প বলত, লক্ষ্মী আর অলক্ষ্মী ছিল দুই বোন ... তারপরে গল্পটা কি ভাবে এগোত ঠিক মনে নেই। গল্পের শেষে মা দু'তিন বার বলত 'লক্ষ্মী এস, অলক্ষ্মী যাও — লক্ষ্মী এস, অলক্ষ্মী যাও ...' আমাদের বাড়িতে অলক্ষ্মী এসে এমন ভাবে বসে গেছে, যাওয়ার আর নামটি নেই। একবার মা যখন ওকে এই গল্পটা শোনচ্ছিল তখন দাদী হেসে উঠেছিল। মা অমনি গল্প বন্ধ করে দাদীর সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিল। দাদী সেদিন বারবার কেবল একটা কথাই বলছিল — যে বাড়িতে অলক্ষ্মীর বাসা সে বাড়ির নাকি ছায়া মাড়াতে নেই! দাদী আর মায়ের ঝগড়াগুলো শুনতে দারুণ মজা লাগত। তখন অত ছোট না হলে তো মিছিমিছি ভয় না পেয়ে খুব, খুব হাসতেও পারত। দাদী ঝগড়ার সময় কখনও বেশি গলা তুলত না। আস্তে করেই এমন এক একটা কথা ছাড়ত, মায়ের মাথা জ্বলে যেত। মা সারাদিন নেচে বেড়াত আর দাদী লেপের মধ্যে মুখ ঢেকে অবিরাম বলে যেত রাম, রাম, রাম। দেবী আর মায়ের ঝগড়ার ধরন আবার আলাদা। অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেবী কোনও কথা বলে না, শুধু শুনে যায়। তারপর যখন বলতে শুরু করে, তখন ঠিক মায়েরই মতো, থামতে চায় না কিছুতেই। মা আর দেবীর মধ্যে খুব বেশি প্রভেদ নেই। দুজনের গলার স্বরও অনেকটা একরকম — বাবা ঠিকই বলে, দেবী মায়েরই দ্বিতীয় সংস্করণ।

বাবা নিজে কিন্তু অন্য ধাতুতে গড়া। রাগ তো বাবারও খুব বেশি। এত বেশি যে মনে হয় ভূমিকম্প হচ্ছে। কিন্তু তবু বীরুর মনে কেমন করে যেন ধারণা হয়ে গেছে, বাবা মানুষটা আসলে ভালই, বুদ্ধি বিবেচনা আছে। বাবার বদমেজাজের কারণ মা। বাবা যখন মাকে ঠ্যাঙায় তখন বীরুর খুব খারাপ লাগে। ওর তখন বাবাকে ধরেও মারতে ইচ্ছে করে। দু'একবার তো মা ওকে এ ব্যাপারে উসকানিও দিয়েছে, বলেছে, তুই এখন বড় হচ্ছিস, আমাকে রক্ষা করা তো তোরই কর্তব্য। বাবা একবার ওর দিকে তাকিয়ে দেখে নিজের মাথা ঠুকতে শুরু করে দেয়।

বাবাকে মাথা কুটতে দেখলে বীরুর ভারি কষ্ট হয়। সম্ভবত ও আজকাল এটুকু বুঝতে পারে যে মাকে মারধর করার পর বাবা ওই ভাবে নিজেকেও ঠিক অতখানিই শাস্তি দিতে চায়। মা মার খাচ্ছে দেখলে মায়ের জন্যেও ওর কষ্ট হয়। কিন্তু মার খেতে খেতেও মা যখন কথা বলেই চলে তখন বীরুর খুব রাগও হয়। বাবার প্রতি ওর মনোভাব কিন্তু সব সময়ই নরম। কেবল বাবা মাকে মারধর করলে ওর রাগ হয় বাবার ওপর। মোটের ওপর মনে মনে ও ঠিক করে রেখেছে, বাবা আর ও একদলে, আর মা, দেবী অন্য দলে। দেবীকে কেন যে ও মায়ের দলে ঠেলে দিয়েছে তা নিজেই জানে না।

ও আবার চোখ মেলে। ঘুমের ভান করতে করতে বোধ হয় কিছুক্ষণের জন্যে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরে এখন ও একলা, মা বোধ হয় গলিতে কারও বাড়ি গেছে। দেবীও সুযোগ বুঝে বেরিয়ে পড়েছে। দুজনেই এ বাড়ি ও বাড়ি ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। সেটা অবশ্য বাবাও ভালবাসে।

বাবা মায়ের সঙ্গে ফিরল না কেন? বাবা থাকলে মা নিশ্চয় ওকে এত মারতে পারত না। তাহলে জ্বরও আসত না। কিন্তু জ্বরটা হয়তো রোদে ঘোরার জন্যে হয়েছে। পারো কাল থেকে আর ওদের বাড়ি আসেনি। ভারি চালাক! বেশ জানে এখন মায়ের মেজাজের পারা খুব চড়ে আছে। দেবী বোধ হয় ওর বাড়িতেই গেছে। দেবী সেখানেই বসে থাক। আর মা বসে থাক অন্য কারও বাড়ি। বাবা যেখানে আছে সেখানেই পড়ে থাকুক। দাদী আর খোকা তো মরেই গেছে, আমিও এদিকে চুপচাপ মরে যাব ...

নিজের মৃত্যুর কথা ভাবলে বীরুর কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। ও চোখ বুজে নিঃশ্বাস বন্ধ রাখার চেষ্টা করে। এই সময় হঠাৎ মা এলে ওকে দেখে ভাববে বীরু মরে গেছে। মা চিৎকার করবে, বুক চাপড়াবে, বলবে 'শের বেলা বিচ মারয়া' (বনের মাঝে বাঘ মরেছে)। পাড়ার মেয়েরা সব ছুটে আসবে, তারাও মায়ের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলবে, 'শের বেলা বিচ মারয়া'।

ছেলেরা সব এসে ওর চারপাইয়ের চারদিকে ঘিরে দাঁড়াবে। ও শালারা কক্ষনো কাঁদবে না। কিন্তু ওই সময় হঠাৎ পা চুলকে উঠলে এমন মজার খেলাটাই যে মাটি হয়ে যাবে।

আবার ও চোখ মেলে তাকায়। এই সব কল্পনা করতে ওর ভয়ও করে না, মজাও লাগে না। তবে মনে হয়, ও পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো? না হলে এ রকম উদ্ভট চিন্তা ওর মাথায় আসছে কেন।

এ শহরে অনেক পাগল আছে। ও চোখ বন্ধ করে ডান হাতের আঙুলে তাদের গুনতে চেষ্টা করে।

গুনতে গুনতে ওর চিন্তা শহরের পাগলদের ছেড়ে নিজের বাড়ির পাগলদের দিকে ফেরে। এটা কি বাড়ি, না পাগলা গারদ! বাবার কথাগুলো মাথার মধ্যে

কেবলই ঘুরপাক খায় আর ও বিছানায় পড়ে ছটফট করে। মনে করার চেষ্টা করে ওর জ্ঞানে কতবার বাবার হাতে মাকে মার খেতে দেখেছে, বাবা কতবার মদ খেয়ে বাড়ি ফিরেছে, কতবার আটা ফুরিয়ে গেছে আর কত লোকের কাছে কতবার মা আটা ধার করেছে, কত লোকের সঙ্গে মা ঝগড়া করেছে, দেবীকে মা কতবার কি কি গালাগাল দিয়েছে। কিছুক্ষণ পরে সব হিসেব গুলিয়ে যায়। ও চাইছে মা ফিরে আসুক, তাহলে ও মাকে প্রশ্ন করবে বাবা কোথায় থেকে গেল, এখনও ফিরল না কেন?

মা আসে ছুটতে ছুটতে। মাকে দেখেই ভয় পেয়ে যায় বীরু। পাড়ার মেয়েদের নিয়ে এসেছে মা। দেবীর বিষয়ে সব কথা বোধ হয় শোনা হয়ে গেছে। এখন দেবীর খুব বিপদ। এখন যদি দেবী ফিরে আসে তো মায়ের সঙ্গে কী ভীষণ যুদ্ধ ... কল্পনা করেই কেঁপে ওঠে বীরু।

কিন্তু মা এসেই উনুনের মধ্যে লঙ্কা পোড়াচ্ছে। তারপর ওর মাথায় নিজের ডানহাত মুঠো করে ঘোরাতে ঘোরাতে বলছে, তোর নজর লেগে গেছে। ও এবার হেসে ফেলে। মা বোধ হয় জলালপুরণীর পায়ের ধুলো নিয়ে এসেছে। বলছে, বাড়িতে একটু ফটকিরি থাকলে এখনই তোর জ্বর নেমে যেত। বেশ বোঝা যাচ্ছে, কারও নজর লেগেছে, এছাড়া কিচ্ছু নয়।

ফটকিরি থাকলে মা ওর মাথার ওপর সেটা ঘুরিয়ে লঙ্কার সঙ্গে আগুনের মধ্যে ফেলে দিত। সেগুলো পুড়ে গেলে বীরুর হাতে একটা জুতো দিয়ে মা বলত, মার ওটাকে, ওটা ওই জলালপুরণীর ভূত, একেবারে ওর মতো দেখতে।

বাড়িতে অন্য কেউ না হোক, মা যে বদ্ধপাগল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। শহরের অন্য পাগলদের সঙ্গে মায়ের নামটাও গুনতি করে বীরু হাসতে থাকে।

— মা, বাবা কোথায়?

— সে কথা জানে আমার জুতো। (আমি কি জানি!)

— তোমার সঙ্গে আসেনি?

— না।

— তাহলে কোথায় থেকে গেল?

— কে জানে কোন্ চুলোয়!

— কবে আসবে?

— কি করে জানব।

বাবার নাম শুনেই রাগে মায়ের মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে মনে হয় যেন চিন্তায় পড়েছে।

— দেবীটা কোথায় গিয়ে মরেছে? মা বলে ওঠে। বীরু চুপ করে থাকে।

— আমি যখন ছিলাম না কি কি কাণ্ড ঘটিয়েছে সব শুনেছি আমি।

ওর মনটা ধক করে ওঠে আশঙ্কায়।

— আজ আসুক একবার বাড়ি!

মায়ের মনটা অন্যদিকে ঘোরাবার কোনও উপায় খুঁজে পায় না বীরু। চোখ বন্ধ করে ফেলে ভয়ের চোটে কি করে যেন ঘুমিয়ে পড়ে।

— বেরিয়ে যাও এখান থেকে!

বীরু ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে। দেবী মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে, মা রান্নাঘরের দরজা থেকে হুঙ্কার ছাড়ছে।

— আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা বলছি!

— মসিজি, আমার কথাটা তো শোন...

— আমি কারও মসি, চাচী কিছু নই! এই সমস্ত বজ্জাতি তুই করিয়েছিস পারো। আমার মেয়েকে ভুলিয়ে ফুঁসলিয়ে আমাকে এইভাবে বেইজ্জত করা, তারপরে এখন আবার তার হয়ে ওকালতি করতে এসেছিস! নিয়ে যা ওকে তোর সঙ্গে, ওর জন্যে তো কুয়ো খুঁড়েই রেখেছিস, তার মধ্যে ফেলে দে ওকে ধাক্কা মেরে!

— মসিজি!

— চুলোয় যাক তোর মসিজি! তুই ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস সেটা একবার চিন্তাও করলি না?

— একটু শুনবে কথাটা? কি হয়েছে কি তাই শুনি?

— আমি সব শুনেছি। আমার আড়ালে লায়লা-মজনুর পিরিত চলছিল। সব খবর পেয়ে গেছি আমি। সেই পুতনা রাক্ষুসিটাকে একবার দেখতে পেলে তার চুলের ঝুঁটি উপড়ে হাতের মধ্যে গুঁজে না দিই তো আমার নাম জানকী নয়। কি ভেবেছিস কি তোরা আমাকে?

— মা, অন্যকে দোষ দিচ্ছ কেন, আমাকেই মেরে ফেল না!

— তোকে তো এমন ঠ্যাঙাব, হাড়-মাস আলাদা হয়ে যাবে। বংশের নাম ডুবিয়েছিস তুই!

ঝামেলাটা চলছে মা, দেবী আর পারোর মধ্যে, কিন্তু বীরুর হাতের মুঠি শক্ত হয়ে উঠেছে। ওর সমস্ত শিরাগুলো দপ দপ করে লাফাচ্ছে। থেকে থেকে ইচ্ছে হচ্ছে মায়ের চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে বাইরে বের করে দেয়। বাবা এই সময় বাড়িতে থাকলে ঠিক তাই করত। ভগবান যদি বাবাকে এই মুহূর্তে এখানে এনে ফেলেন! না হলে মা তো চিৎকারের চোটে সারা শহরের লোককে জড়ো করে ফেলবে।

পারো মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবীর চোখে জল। মায়ের চিৎকার বীরুর যেমন বিশ্রী লাগে দেবীর কান্নাও ঠিক সে-রকম লাগছে।

— বলি, ব্যাপার যদি কিছু নাই ঘটে থাকে তাহলে এত লোকে সবাই কি

মিথ্যা কথা বলছে? আমি কি চিনি না তোমাদের? এই ভয়ই তো করেছিলাম আমি। দিনরাত দুজনে মিলে ফন্দি আঁটা হচ্ছিল। আমারও যেন বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পেয়েছিল, কেন যে মরতে ওখানে গেলাম। মাঝখান থেকে আমার অমন সোনার বাছাকে হারালাম!

— মসি ওর কি হয়েছিল? পারো একটা সুযোগ পেয়ে যায় প্রসঙ্গ পালটাবার। মা প্রথমটা কোনও উত্তর দেয় না। বোধ হয় ভেবে দেখছে, পারোকে খোকার কথা বলবে, না দেবীর ওপর আরও ঝাল ঝাড়বে।

— কি হয়েছিল ওর? আবার প্রশ্ন করে পারো।

এসে পর্যন্ত মা খোকার অসুখ এবং মৃত্যুর কথা বিস্তারিত ভাবে কারও কাছে বলার অবসর পায়নি। বীরুও শোনে কান খাড়া করে, খোকার মৃত্যু সম্বন্ধে সব কথা সেও জানতে চায়। ওর যেন এখনও বিশ্বাসই হচ্ছে না, খোকা সত্যিই নেই! মনে হচ্ছে, মা হয়তো রাগের মাথায় খোকাকে কোথাও ফেলে এসেছে।

মা চোখ মুছছে। মায়ের রাগ পড়ে আসছে দেখে দেবীও আস্তে আস্তে পারো আর মায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়। এই সময় মা যদি ওকে আর কিছু না বলে তাহলে বুঝতে হবে এখনকার মতো দেবীর ফাঁড়া কাটল। এখন আবার বাবা না এসে পড়ে। তাহলেই পরিস্থিতি যেটুকু সামলেছে আবার বিগড়ে যাবে। বীরু বিছানায় উঠে বসে।

— শুয়ে থাক। জ্বরের ওপর গায়ে হাওয়া লাগলে তখন কি করব?

যতই গরম লাগুক, সব সময় হাওয়া লেগে যাওয়ার ভয় পাচ্ছে মা। যেন সব কিছু অসুখের মূলে ওই হাওয়া।

— কি হয়েছিল মসি, কত দিন অসুখ ছিল? হাকিম বৈদ্য কিছু দেখিয়েছিলে তো? সেখানে গ্রামে কি আর ডাক্তার আছে?

মা বসে পড়ে রান্নাঘরের রোয়াকে। দেবী আর পারোও বসে সেখানে।

— হায় রে! কিছুই তো হয়নি তার, কার যে নজর লেগে গেল, খেয়ে ফেলল ছেলেটাকে। যেদিন থেকে ওখানে পৌঁছেছি, সকলের এক কথা, 'জানকী, তোর ছেলেটি কেমন মোটাসোটা! ক'বছরের হল?' আমি বলি, এই তো সবে এক বছরেরটি! তাই শুনে সব চোখ বড় বড় করে ওর দিকে চেয়ে থাকত। বলে কিনা, ও মা, দেখলে তো দু'তিন বছরের ছেলে বলে মনে হয়! ব্যস সেইদিনই এমন তেড়ে জ্বর এল, বাছা আর চোখ মেলে চাইল না।

— কোনও ওষুধপত্তর ...

— ওষুধ কোথায়! এর তো সেখানে গিয়েও বদসঙ্গী জুটল। মায়ের শ্রাদ্ধেও মদ চলল। ওষুধ আনবে কে? আমার কাছে তো কানাকড়িও থাকে না। যাকেই বলি, সে বলে — ও ঠিক হয়ে যাবে। জ্বর হয়েছে, ছেড়ে যাবে'খন।

হাঁটুর ওপর থুতনি রেখে মা বসে। অল্প অল্প দুলছেও। চোখ দিয়ে ঝরছে

জলের ধারা। মা কাঁদছে নিঃশব্দে, এখন বীরুর ততটা খারাপ লাগছে না। মায়ের এই দুঃখী চেহারাটার সঙ্গে আসলামের মা'র অনেকটা মিল আছে। হাফিজার চেহারার সঙ্গে দেবীর কোনও মিল নেই। দেবীর চোখ খুব ছোট ছোট, হাফিজার চোখ টানা টানা। হাফিজার হাত কি নরম, দেবীর হাত খরখরে। কিন্তু হাফিজার হাত কি বীরু ছুঁয়েছে কোনও দিন — ঠিক মনে পড়ে না। ওর অসুখের খবর পেলে আসলাম নিশ্চয়ই ওকে দেখতে আসত। যদি আসে তো মাকে বলা চলবে না আসলাম মুসলমান। আসলাম খুব ফরসা, মা বলে মুসলমানেরা নাকি কালো হয়। কিন্তু মা যদি নাম জানতে চায়? যা হোক একটা নাম বলে দিলেই হবে, ও বলে দেবে, রামলাল। কিন্তু কোথায় আসলাম আর কোথায় রামলাল! মুসলমানদের নামগুলো বেশ জোরদার আর গালভরা হয় কিন্তু। কোথায় হাফিজা আর কোথায় দেবী! পারো নামটাও এমন কিছু নয়। নরেশ নামটা তবু একটু ভাল। দেবীর বিয়ে যদি নরেশের সঙ্গে হয় তবে দেবীর সঙ্গে ও-ও লাহোর চলে যাবে। ওখানেই থাকবে সারা জীবন। এখানে বাবা আর মা বসে বসে যত খুশি ঝগড়া করুক। ওখানে হয়তো হাফিজার সঙ্গেও দেখা হয়ে যাবে। বাবার একজন বন্ধু ছিল, কি যেন নাম, সে ওকে খুব ছোটবেলায় মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করত — বীরু, তুই বড় হয়ে কাকে বিয়ে করবি? মাকে না বোনকে? একদিন বাড়িতে এসে মাকে বলেছিল কথাটা। মা বলেছিল, এবার জানতে চাইলে বলে দিস — তোমার মাকে। সে লোকটি এখন কোথায় কে জানে! এখন যদি কেউ ওকে বলে, বীরু তুই কাকে বিয়ে করবি? তাহলে ও সোজা বলে দেবে হাফিজাকে, নয়তো পারোকে। কিন্তু ওরা দুজনেই তো ওর চেয়ে অনেক বড়! তা হোকগে যাক! লাহোর গিয়ে ও-ও অনেক বড় হয়ে যাবে।

মা বলছে, — হায় রে, দুঃখ কি আমার একটা যে বলব? আমার কপালটাই পোড়া।

পারো বলে — কিন্তু মসিজি, তুমি ওকে তোমার ট্রাঙ্কের চাবি দিলে কেন?

— না দিলে তো গাড়ির মধ্যেই আমাকে ঠ্যাঙাতে শুরু করত। আমি আর কি জানি। আমাকে বলল, গয়নাগাঁটি আছে, কোথায় হারিয়ে ফেলবি, আমার কাছেই থাক। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু আমার কথা কি শোনে সে কোন দিন?

— কিন্তু তারপর সে গেল কোথায়? একই ট্রেনে তো আসছিল?

— কি করে জানব? এখানে এসে যখন স্টেশনে নামলাম, তো ওকে কোথাও দেখা গেল না। এখন আমি কি করি? কাকেই বা বলি? কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে! সেই জেহলম স্টেশনেই নিশ্চয় থেকে গেছে। হায় হায়, আমার পুরো পাঁচ তোলা সোনার বালাজোড়া ছিল গো।

বীরু অবাক হয়ে ভাবে, বাবার কথা বলতে বলতে হঠাৎ মা বালার ওজন বলছে কেন?

— মসিজ্জি, উনি গহনা নিয়ে করবেন কি?

— কি করবেন? বিক্রি করে, খেয়ে দেয়ে সর্বস্ব উড়িয়ে খালি হাতে ফিরে আসবেন। আবার কি করবেন! পারো তুই জানিসনে ওর স্বভাব! আমার দুঃখের কথা কেউ যদি বসে শুনত!

এরপর মা নিজের দুঃখের কাহিনী শুরু করে দেয়। এসব গল্প বীরুর অনেকবার শোনা। ওগুলো শুনে ওর এখন আর কিছুই মনে হয় না। বারবার শুনে গল্পগুলো এমন পচে গেছে, ওর এখন দু'কানে আঙুল গুঁজে দিতে ইচ্ছে করছে। যতক্ষণ মা কথা বলে, বীরু মুখ, মাথা ঢেকে বিছানায় পড়ে কেবল এপাশ ওপাশ করতে থাকে।

হঠাৎ মায়ের কথা বন্ধ হয়ে যায়। বীরু ভাবে, বাবা এসে গেছে বোধ হয়। মুখ থেকে চাদর সরিয়ে, দেখে বহেনজি দাঁড়িয়ে আছে। মা চোখ বড় বড় করে দেখছে তাকে। দেবী উঠে ঘরে ঢুকে যায়। দু'এক মিনিট সবাই একেবারে চুপ, কেবল পরস্পর পরস্পরকে দেখতে থাকে। বীরু ভাবছে মা যে কোনও মুহূর্তে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়বে বহেনজির ওপরে, চেঁচিয়ে বলবে, 'বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে!'

বহেনজি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে মায়ের দিকে। ঠোঁট কাঁপছে মায়ের। খুব রেগে গেলে, অথবা কান্না পেলে মায়ের ঠোঁট কাঁপে। এখন মনে হচ্ছে, একই সঙ্গে মায়ের রাগও হচ্ছে, কান্নাও পাচ্ছে।

— ভাবী, খোকার খবর শুনে খুব দুঃখ পেলাম।

বহেনজি মাকে বলে ভাবী, আর বাবাকে বলে ভ্রাতাজি। বীরু ভাবছে, মা নির্ঘাত বলে উঠবে, 'পুতনা ধাই! তুই বেরিয়ে যা আমার বাড়ি থেকে!' কিন্তু মা চুপ করেই থাকে। মা'র চোখে জল এসে গেছে। বহেনজি এসে বসল মায়ের কাছে। বীরু উঠে বসে বিছানায়।

মা এমন ভাবে বহেনজির দিকে তাকাচ্ছে যে বীরু ঠিক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কোন দিকে গড়াবে। ওর ধারণা ছিল বহেনজিকে দেখলেই মা একেবারে রাগে দিশেহারা হয়ে পড়বে, প্রচণ্ড গালিগালাজ আরম্ভ করে দেবে। মাকে এমন চুপচাপ থাকতে দেখে ও কিছুটা নিরাশ হয়ে আবার শুয়ে পড়ে।

— ভ্রাতাজি কোথায়?

— উনি এখনও আসেননি, পারো বলে।

— ভ্রাতাজিকে যা বলতে চাও সেটা আমাকেই বল শুনি। তুমি ভাবছ মেয়েটাকে যে ভাবে ফুঁসলিয়েছ, তেমনই মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে ওকেও বোকা বানাবে? কিন্তু শুনে রাখ, যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, এ বিয়ে হবে না, হবে না!

— আগে আপনার রাগ ঠাণ্ডা হোক, তারপর ...

— এ সব আদুরেপনা আমার সহ্য হয় না। তোমার এসব মন ভোলানো কথা আমি শুনতেও চাই না। সব কথা আমার কানে এসেছে।

— কি শুনেছেন আপনি?

— ব্যস, বেশি কথা বাড়াবার কোনও দরকার নেই। তুমি নিজেকে বড় চালাক মনে কর। চালাক তো তুমি আছই, চালাক না হলে কি আর ... যাক গে, তুমি যা করেছ তার শাস্তি ঈশ্বরই দেবেন তোমাকে! তুমি ভেবেছিলে কথাটা একবার যদি সারা শহরে রটে যায় তাহলে আমরা আর 'না' করতে পারব না। তোমার ওই আওয়ারা উড়নচণ্ডী ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার আগে মেয়েকে আমি বিষ খাইয়ে দেব। জাত, কুল, বংশ পরিচয় কোনও কিছুর ঠিক-ঠিকানা নেই, বলি, ও তোমার কে হয় তাই শুনি?

— বীরু আপনার যা হয়, ও আমার তাই। তাছাড়া...

— আরে যাঃ যাঃ, কাকে ভোলাচ্ছিস তুই? সব জানা আছে আমার। লোকে কি বলে তা একবার শুনে আয় গিয়ে! একটু লাজ-লজ্জাও যদি থাকত ... কে বিশ্বাস করবে যে ও তোর ছেলে? আমার মেয়েকে নিয়ে টানাটানি কেন? নিজেই ওকে বিয়ে করে ফেল না!

এই কথা শুনেই উঠে দাঁড়ায় বহেনজি, তারপর আর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে যায়।

বীরু মায়ের কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেনি। ও অবাক হয়ে ভাবতে থাকে ঝগড়াটা এত চটপট শেষ হয়ে গেল কি করে?

দেবী কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে, তারপর চিৎকার করে বলে ওঠে, — তুমি আমার মা নও, তুমি আমার শত্রু।

দেবীর চিৎকারের জবাবে মা-ও চিৎকার করে — তুই আমার মেয়ে নোস, তুই আমার সতীন, সতীন!

দেবী কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়। পারো কানে হাত দিয়ে বেরিয়ে যায় দেউড়ি থেকে।

বীরুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মা বলে ওঠে — তুই যদি একটু বড় হতিস তো তোকে নিয়েই অনেক দূরে কোথাও পালিয়ে যেতাম এই নরক থেকে।

চাদরে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে বীরু। এই নরক থেকে পালিয়ে কোথায় যেতে চায় মা? নরক তো মা নিজেই তৈরি করেছে। মা যেখনে যাবে সেখানে নরকও যাবে সঙ্গে সঙ্গে। বাবাও তো কত সময় রাগের ঝোঁকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা বলে, নিজের গলা টিপে মারবে বলে ভয় দেখায়। দেবীটা ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করেছে কেন? নিজের গলা টিপছে না তো? টিপুক গে! বাবা তো হামেশাই বলে — এমনি করে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ঢের ভাল।

বীরুর কানের মধ্যে মা'র বকবকানি ঢুকছে যেন জ্বলন্ত গলানো ধাতুর মতো। একটু যদি বড় হত, ও নিজেই কোথাও পালিয়ে যেতে পারত। বাবা যে কোথায় পালিয়েছে কে জানে! আর বোধ হয় ফিরে আসবে না। কথাটা মনে হতেই বীরু কেঁপে উঠল।

মা ঘরের দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর বলছে,—খোল দরজা, নয়তো সারা পাড়ার লোক ডেকে জড়ো করব! এটা করে মা কি আনন্দ পায় কে জানে, মায়ের কি একটুও লজ্জা করে না? এই সময় বাবা যদি ফিরে আসে তো মাকে উচিত শিক্ষা দেবে। মাকে মেরে যদি একেবারে চাটনি বানিয়ে ফেলে তো ঠিক হয়।

বীরুর মুখটা যেন একেবারে তেতো হয়ে আছে। সকাল থেকে খায়নি কিছু। ঠোঁট দুটো শুকিয়ে উঠেছে, কিন্তু মায়ের কাছে ও কিছু চাইবে না। তাহলেই মা এক্ষুনি আবার কাঁদুনি গাইতে শুরু করবে। বীরু দাঁতে-দাঁত টিপে থাকে। এমন করে শুয়ে শুয়ে মরে গেলে এই নরক থেকে তো মুক্তি পাওয়া যাবে। ওর কান্না পেয়ে যায়। একটু যদি বড় হত তাহলে ও নিশ্চয়ই পালিয়ে যেত কোথাও। এই নরকে পড়ে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল!

মা যেই নরকের নাম করেছে, তখন থেকেই যেন বীরুর কল্পনার ডানা গজিয়েছে। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করছে, কেউ যেন ওর শরীরের মধ্যে হাওয়া ভরছে। একটু পরে ওর মনে হয় ও যেন ঠিক বেলুনের মতো আকাশে উঠে উড়ে চলেছে। মায়ের গলার স্বর বহুদূর থেকে ভেসে আসা অস্পষ্ট কোলাহলের মতো কানে আসছে। ওর চোখে জল আর ঠোঁটে হাসির রেখা। ওকে আকাশে উড়তে দেখে মা যখন বুক চাপড়াতে থাকবে তখন ও তার ওপর থুতু ফেলে দেবে। সব ছেলেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে, লাফিয়ে লাফিয়ে ডাকবে ওকে। ও কিন্তু কারও কথা শুনবে না। হাসতে হাসতে আরও আরও অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। উড়তে উড়তে সেই আকাশে গিয়ে একটা তারা হয়ে থাকবে। সেখান থেকে মাকেও দেখা যাবে না, বাবাকেও না, দেবীকেও না, পারোকে না, আসলাম, হাফিজা, স্কুল, মাস্টার, কিচ্ছু দেখা যাবে না, কিচ্ছু না ...

জ্বর দারুণ বেড়ে গেছে বীরুর।

পনেরো

বিছানায় শুয়ে শুয়ে বীরু একমনে নিজের হাতের দিকে চেয়ে আছে। এত মন দিয়ে দেখছে যেন কোনও বই পড়ছে বুঝি। এ রকম করতে মা ওকে বারণ করেছে অনেকবার। একশ বার অন্তত বলেছে ওইভাবে একদৃষ্টে হাতের দিকে চেয়ে থাকলে নাকি বেশি দুঃখ পেতে হয়। বীরু আপন মনেই হাসে। ঠোঁটের ওপর শুকিয়ে মামড়ি পড়েছে, হাসতে গেলে চিড়িক করে ব্যথা লাগে। ও ঠোঁটের ওপর জিভটা বুলিয়ে দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ায়। ঠোঁট কামড়াতেও মা মানা করেছে। ঠোঁট কামড়াতে নেই বাপ, ওতে দুঃখ বাড়ে। বীরু আবার হেসে ফেলে, তারপরেই ব্যথায় আবার ঠোঁট কুঁচকে যায় ওর। নাকটাও চুলকোচ্ছে, কিন্তু নাক চুলকোলেও নাকি দুঃখ বাড়ে। হেসে ফেললেই ফাটা ঠোঁট আরও ফেটে যাচ্ছে। বীরু উঠে আলমারি থেকে আয়না নিয়ে আসে। আয়নাটা ভাঙা, একবার রাগের মাথায় বাবা আয়নাটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলেছিল। অসুখের সময় আয়নায় মুখ দেখলেও দুঃখ বাড়ে। সব দুঃখ ভুলে আয়নার গায়ে ঘেন্নাধরা নিজের চেহারাটা দেখে বীরু হাসতে থাকে।

মা বোধ হয় মন্দিরে গেছে। দেবীও বাড়ি নেই। মা যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ মেয়েদের ভিড় লেগেই থাকে। একজন যায় তো আরও তিনজন এসে হাজির হয়। সবাই একসঙ্গে কথা বলতে শুরু করে। এত হট্টগোল হয় যেন মেলা বসে গেছে। আগে কখনও ওদের বাড়িতে এত মেয়ে আসত না। দেবী বলে, এরা মাকে আরও উসকে দিতে আসে। মা বলে, লোকের দুঃখে সহানুভূতি জাগে, তাই তো সবাই আসে। নইলে কার দায় পড়েছে নিজের কাজকর্ম ফেলে অন্যের কাছে এসে বসে থাকবে! কেউ সহজ ভাবে কথা বললেই মা ভাবে তার বুঝি মায়ের প্রতি সহানুভূতি জেগেছে।

প্রতিদিন তাদের সামনে মা নিজের সেই বালাজোড়ার ওজন আর দামের কথা বলতে বলতে মুখ বিকৃত করে কান্না জুড়ে দেয়। মায়ের ওই কান্নাবিকৃত মুখ দেখে দেখে বীরুর বিতৃষ্ণা ধরে গেছে। সেই মুখ দেখলেই বীরুর ভেতরটা এমন করতে থাকে — এখনই যেন বমি করে ফেলবে। আয়নাটা ও উপুড় করে নিচে রেখে

দেয়। এক মহিলা মুখ চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে মাকে বলছে, বোন, বালাজোড়া গেছে তো যাক, এখন ভগবানকে ডাক যাতে তোমার ঘরের কর্তাটি সুস্থ শরীরে ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে আসে। কথাটা শুনেই মা নিজের দুঃখের কাহিনী প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আবার একবার শুনিয়ে দেয়। জেহলম স্টেশনে কি ভাবে বাবা ট্রাঙ্কের চাবি চেয়েছিল, মা কি ভাবে, কত রকম অজুহাত দেখিয়ে চাবিটা কাছে রাখতে চেয়েছিল, শেষ পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল, আর চাবি নিয়ে ট্রাঙ্ক খুলে বাবা বালা বের করে নিল। মায়ের প্রাণটা একেবারে ধক করে ওঠে, বাবা বালা নিয়ে চলে যায়, মা শুধু তাকিয়ে দেখতে থাকে পিছন থেকে। একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল বাবার পুরনো বন্ধু রামলাল। মা চেয়ে থাকতে থাকতেই গাড়ি চলতে শুরু করে দেয় ধীরে ধীরে। মা চিৎকার করে ডাকতে থাকে কিন্তু বাবা পিছন ফিরে তাকায় না পর্যন্ত। বাবার কাছেই ছিল দুজনের টিকিট। বাকি পথটা মা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে। গাড়ির অন্য সব যাত্রীরা মাকে অনেক সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু মা তো তখন বুঝেই গেছে, বাবা ওই বালা বেচে দিয়ে সব টাকা উড়িয়ে পুড়িয়ে তবেই ফিরবে। মেয়েরা এই গল্প শুনে গালে হাত দেয় আর মা চোখ মুছতে থাকে আঁচল দিয়ে।

আয়নাটা উঠিয়ে নিয়ে বীরু আবার মুখ দেখে। জ্বর হয়ে গাল দুটো বসে গেছে, চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। মাথার চুল রুক্ষ, গায়ের রং একেবারে ফ্যাকাশে। আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে ওর মাথা ঘুরতে থাকে। আয়নাটা বুকের ওপর রেখে ও চোখ বন্ধ করে। জ্বালা করছে চোখ দুটো।

একটুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর একজন মহিলা বলে ওঠে, — এমন কাণ্ড এই প্রথম শুনছি বাপু। এরপর আবার সবাই মিলে কচকচানি শুরু করে দেয়। কিছুক্ষণ কেউ একে অন্যের কথাই শোনে না। তারপর মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে — আজ পাঁচ দিন হয়ে গেল। তার এটুকুও চিন্তা হচ্ছে না বাড়িতে ভাল মন্দ কি ঘটছে, আমার কাছে একটা পয়সা নেই, ছেলেটার অসুখ! এবার সকলের মনোযোগ এসে পড়ে বীরুর ওপর। কিছুক্ষণ ধরে সব কজন মহিলাই ডাক্তারি আর হেকিমি বিদ্যা জাহির করতে থাকে। রকম বেরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা দিয়ে শেষ পর্যন্ত সব ক'জন বিদায় হলে মা এসে দাঁড়ায় বীরুর মাথার কাছে। মুখে গভীর চিন্তার ছাপ। বীরু মায়ের দিকে তাকাতে চায় না, মুখ ঘুরিয়ে রাখে। মা বলছে — তুই আর কত দিন এভাবে বিছানায় পড়ে থাকবি বল তো! কোনও দিক থেকে শান্তি নেই আমার। বীরুর তখনই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু দাঁড়াবার কথা চিন্তা করলেও যেন দেহের এখানে ওখানে ব্যথা করতে থাকে। নিজের ওপরেই রাগ ধরে বীরুর। মা মাথার কাছে দাঁড়িয়ে না থাকলে ও নিজের চুলের গোছা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলত।

শুয়ে শুয়ে থেকে দুর্বল বীরুর চোখে তন্দ্রা নামে। ও পাশ ফিরে শোয়।

আয়নাটা গড়িয়ে নিচে পড়ে তিন টুকরো হয়ে যায়। আগেই ফেটে তিনটে চিড় ধরেছিল, এখন ফ্রেম থেকে খুলে বেরিয়ে আসে। বীরু টুকরোগুলো তুলে ফ্রেমে লাগাতে চেষ্টা করে। একটু পরেই কোমরে যন্ত্রণা হয়, চোখের সামনে কালো কালো ছায়া ভাসে, ছায়া আসে যায়। হঠাৎ কি যেন হয়ে যায় ওর, আয়নার ভাঙা টুকরোগুলো সজোরে ছুড়ে মারে সামনের দেওয়ালে। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে কাচের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে।

— বীরু, এসব কি করেছিস, কি হয়েছে তোর?

দেবীর গলা শুনে চমকে ওঠে। কোনও জবাব না দিয়ে শুয়ে পড়ে বিছানায়, দেবীর দিকে চেয়ে থাকে। দেবীর হাতে একটা গেলাস।

— তোর জন্যে দুধ গরম করে এনেছি। এখন এর মধ্যে যদি কাঁচের টুকরো পড়ে থাকে, তাহলে? তোর কি হয়েছে বল তো? হঠাৎ হঠাৎ এমন পাগলের মতো করিস কেন?

বীরু কোনও উত্তর দেয় না। দেবী বোধ হয় পারোর বাড়ি থেকে দুধ এনেছে। মা টের পেলেই ঝগড়া করবে দেবীর সঙ্গে। অন্য বাড়ির দুধ মা বীরুকে খেতে দেয় না। — যদি দুধে কেউ কিছু মিশিয়ে দেয়? মায়ের যে কেন এত ভয়, বীরু ভেবে পায় না।

— আমি দুধ খাব না।

— আরে বাবা, আমি ছেঁকে নিয়ে আসছি এখনই। খেয়ে নে, মা যদি হঠাৎ এসে পড়ে তো আমার দফা শেষ।

— না, আমার খিদে নেই।

— সকাল থেকে না খেয়ে আছে, আবার বলে খিদে নেই! তোর জন্যেই তো পারোর কাছ থেকে চেয়ে আনলাম।

— না, না, না।

— ঠিক আছে, খেতে হবে না। দেবী আবার বাইরে চলে যায়।

এই সময় মা হাজির হলে ওকে অনেক কথা শুনতে হবে। কিন্তু দেবী তো আসলে দেখতে এসেছিল মা ফিরেছে কিনা। দুধটা একটা অজুহাত মাত্র। এখন ও আবার বহুক্ষণ পারোর সঙ্গে গলাগলি হয়ে বসে থাকবে। মা যেই ঘরে ঢুকবে, পায়ে কাচের টুকরো ফুটে যাবে। ফুটুক না! তারপর কিছু দিন অন্তত মাকে ঘরে বসে থাকতে হবে। কিন্তু মা ঘরে বসে থাকলেই তো বাড়িতে আবার মেয়েদের মেলা লেগে থাকবে। বীরু চিন্তায় পড়ে যায়। মা বাড়িতে বসে থাকলে বীরুর ভাল লাগে না বটে, কিন্তু মা বাইরে ঘুরে বেড়ালে ওর অনেক বেশি খারাপ লাগে।

মা কি এতক্ষণ ধরে মন্দিরে বসে আছে নাকি? সেখান থেকে নিশ্চয় আগেই ফিরে এসেছে, তারপর পথে কারও বাড়িতে ঢুকে দেবীর কাণ্ডকারখানা বলতে বসে

গেছে। বাড়িতে মেয়েরা এলে মা প্রাণভরে নানা কথা শোনায়, কিন্তু দেবীর কথা বলবার সুযোগ তো সব সময় ঘটে না। দেবী বাড়িতে থাকলে মা খুব চাপা গলায় ওর সম্বন্ধে একটু আধটু বলে। একদিন তো সকলের সামনেই দেবী মাকে চোখ রাঙিয়ে কথা বলেছিল।

দেবীকে নিয়ে আলোচনা করার জন্যে কেউ না জুটলে শেষ পর্যন্ত মা বীরুর কাছেই বকবক করতে শুরু করে। বীরু অনেক সময় বুঝতে পারে না মা কি বলতে চাইছে। বলে, আমি সব খবরই নিয়েছি। হতভাগাটার ঘরদোরের কোনও ঠিক নেই। লেখাপড়া কিছু শেখেনি। ছোটবেলায় পালিয়েছিল বাড়ি থেকে। ওর নিজের বাপ মা কারা, তারা থাকে কোথায়, এখনও বেঁচে আছে কি না সে সব ও কিছুই জানে না। একদিন বীরু বলেছিল, ওই বহেনজি ওর মা নয়। ব্যস, তারপর কি কাণ্ড, পুরো দু'ঘণ্টা ধরে মা বহেনজিকে নিয়ে এমন এমন সব কথা বলে গেল যার একতিলও বহেনজির কানে গেলে সে বোধ হয় মাকে খুনই করে ফেলত। কিন্তু এখনও বীরু ভাল করে বুঝতে পারে না, বহেনজি যদি নরেশের আসল মা না-ই হয়, তাহলে সে নরেশের কে?

দেবীকেও ও এই প্রশ্নটা করেছে। কথাটা এড়িয়ে গিয়ে দেবী শুধু বলে, বহেনজি নরেশের ধর্ম-মা। বীরু মাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ধর্ম-মা কাকে বলে। তার জবাবে মা যা বলেছিল তাতে বীরুর লজ্জা করতে থাকে। মনে মনে ঠিক করে ফেলে আসলামকে একদিন জিজ্ঞেস করবে মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-মা হয় কিনা!

কতদিন হয়ে গেল দেখা হয়নি আসলামের সঙ্গে। সে বোধ হয় জানেই না আমার জ্বর হয়েছে। জানলেও সে আমাদের বাড়িতে আসত না। সেদিন স্টেশনে আসলাম কেন যে রেগে গেল কে জানে। ফেরার পথে ভাল করে একটা কথাও বলেনি। অবশ্য সেদিন হাফিজা চলে গেল, তাই হয়তো ওর মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। হাফিজা বলেছিল, — বীরু, তুমি আসলামের সঙ্গে লাহোর চলে এস।

আসলাম হয়তো এতদিনে লাহোর চলে গেছে।

নরেশের সঙ্গে দেবীর বিয়েটা হলে, ও-ও তো দেবীর সঙ্গে লাহোর যেতে পারত। কিন্তু এখন দেবীর বিয়ে আর যার সঙ্গেই হোক নরেশের সঙ্গে কিছুতেই হবে না। মা তো পরিষ্কার বলে দিয়েছে, আমি মরে গেলেও তোর বিয়ে ওই বখাটে ছোঁড়ার সঙ্গে দেব না। দেবীও বলেছে, সারাজীবন কুমারী থাকব সেও ভাল, কিন্তু অন্য কাউকে বিয়ে করব না। যেদিন বহেনজি দেখা করতে এল আর মা তাকে অনেক খারাপ কথা বলে তাড়াল, সেই দিনই ওই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছিল দেবী। এখন তো বহেনজী নরেশকে নিয়ে লাহোরে ফিরে গেছে। তবুও দিনের মধ্যে দু'তিনবার দু'পক্ষই পরস্পরকে কথা শুনিয়ে দেয়। মা কপাল চাপড়ে বলে ওঠে, যে দিন তুই জন্মেছিস সেই দিন থেকেই আমার দুর্ভাগ্য শুরু হয়েছে। দেবীও ঠিক মায়ের কথার ধরন নকল করে একই সুরে জবাব দেয় দু'একটা শব্দ এদিক ওদিক করে। তা শুনে মা আরও রেগে দাঁতে দাঁত ঘসতে থাকে।

একদিন মা যখন বাড়ি নেই, সেই সময় পারো এসে দেবীর কানে কানে কি যেন বলে। তাই শুনে দেবী আকুল হয়ে কাঁদে। সেদিন থেকে দেবী আর মায়ের সঙ্গে কথা বলছে না। মা যা খুশি বলে যায়, দেবী কোনও উত্তর দেয় না। ফলে, মা খুব চটে যায়। এত চটে যায় যে কাঁদতে শুরু করে।

পারো আর দেবীরও আজকাল দেখা-সাক্ষাৎ কমই হয়। দেবী তো সব সময়ই বাড়িতে বসে থাকে। যদি কখনও পারো আসে তাহলে দুজনেই বসে থাকে চুপ করে। ওদের অমন নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে বীরুরও খুব মন খারাপ হয়ে যায়, কিন্তু ওরা দুজনে ওকে লক্ষ্যই করে না। কিছুক্ষণ পরে পারো উঠে দাঁড়ায় যাওয়ার জন্যে, দেবী তখন ওকে আর একটুখানি থাকার কথাও বলে না। বীরু পারোর দিকে তাকিয়ে থাকে কিন্তু পারো ওকে দেখে হাসে না, একটা কথাও বলে না ওর সঙ্গে। দুজনকেই যেন সাপে শুঁকে দিয়েছে। আগে যেমন বেশি কথা বলত এখন তেমন কথা বলে না।

আজ ওরা দুজনে কি আলোচনা করছে কে জানে। বহেনজি আর নরেশ লাহোর থেকে ফিরে আসেনি তো? মা কোথায় যে গেছে, অনেকক্ষণ হয়ে গেল। ওকে বেরোবার সময় বলে গিয়েছিল, 'এক্ষুণি চলে আসব। তোর জন্যে চরণামৃত নিয়ে আসব।'

হঠাৎ যদি বাবা এসে যায় তো বেশ মজা হয়। আমি বাবার কাছে ঠিক জেনে নেব বালাটা নিয়ে কি করেছে। নরেশের কথা সব বাবাকে বলে দেব। বাবার কোলে বসে বসে... বাবার কথা মনে পড়তেই গলার কাছে ভারী হয়ে আসে। ও চোখ বন্ধ করে ফেলে। মনে হয়, বাবা বুঝি সামনে দাঁড়িয়ে টলছে, মাকে গালি দিচ্ছে, নিজের মাথা ঠুকছে, নয়তো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ মাথা নিচু করে। বাবা সব সময় মাথাটা নিচু করে থাকে কেন? যেমনই হোক, বাবাকে কিন্তু ওর ভালই লাগে। এখন যদি কোনও রকমে বাবা এখানে এসে পড়ত ...

দেউড়ির দরাজটা খুলে গেল। বীরু এক ঝটকায় উঠে বসে। দরজাটা আবার বন্ধ হল। বীরু নেমে পড়ে চারপাই থেকে। সামনে বাবা দাঁড়িয়ে। সেই ঢিলেঢালা পাগড়ি, বেড়ে ওঠা দাড়ি, সেই ময়লা নোংরা জামা-কাপড়, ছেঁড়া জুতো, মাথা ঝুঁকে পড়েছে, দুই চোখ লাল, দৃষ্টি মাটির দিকে। বীরু ছুটে এসে বাবার হাঁটু জড়িয়ে ধরে, বাবা হাত বোলায় ওর পিঠে। বীরু দেখে বাবাকে, বাবার চোখে জল। বীরুর দৃষ্টির মধ্যে যে প্রশ্ন রয়েছে তা বাবার কাছে পৌঁছেছে। বাবা সোজাসুজি তাকাতে পারছে না। বীরু বাবাকে টেনে নিয়ে যায় চারপাইয়ের কাছে। ওর ঠোঁট কাঁপছে। বাবা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে। বীরুর এত ভাল লাগছে, ওর চোখের দৃষ্টি যেন আবেশে জড়িয়ে আসছে।

— আয়নাটা ভেঙে গেল কি করে?

— আমি ভেঙে ফেলেছি।

বাবা কিছু বলে না। বীরু ভাবে বাবা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে মা কোথায়। কিন্তু বাবা মা বা দেবী সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করে না। বীরু অবাক হয়ে চেয়ে আছে বাবার দিকে। বাবা কিন্তু ওর চোখের দিকে তাকাচ্ছেই না, লজ্জা পাচ্ছে যেন। বীরু জানতে চাইছে, বাবা কোথায় ছিল এতদিন, মায়ের সঙ্গে আসেনি কেন, মায়ের বালাটার কি হল, মা কি সত্যি-কথা বলেছে যে ... রামলাল লোকটা কে? জেহ্‌লাম স্টেশনে সে এল কি করে? বীরুর জানতে ইচ্ছে করছে, বাবা ওর জন্যে কি এনেছে। বাবার মালপত্র কোথায়? ... কত কি আবোল তাবোল কথা যে জানতে ইচ্ছে করছে বাবার কাছে। ও বলতে চায়, কত দিন ধরে ওর জ্বর চলছে, মা মন্দিরে গেছে, মা আর দেবী ঝগড়া করে, নরেশ... কিন্তু নরেশের বিষয় কি বলবে, বাবা তো জানেই না বোধ হয় কে নরেশ ...

কিন্তু বীরু প্রশ্নও করে না, বলেও না কিছু। শুধু অর্ধেকটা শরীর বিছানায় আর বাকিটা বাবার কোলের মধ্যে এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে পড়ে দেখে। দেখে এত খুশি হয়েছে, ও যেন বাবাকে অভয় দিতে চাইছে — ভয় পেয়ো না বাবা, দেখ, আমি তোমায় কিছু জিজ্ঞেস করব না।

কিন্তু বাড়িতে পৌঁছেই বাবা যেন কি এক চিন্তায় ডুবে রয়েছে। চিবুকে হাত রেখে এমন ভাবে বসে আছে যেন কত কাল থেকে তার ওই একটাই ভঙ্গি। বীরুর ইচ্ছে করছে বাবার পেটে সুড়সুড়ি দিয়ে দেয়।

— তোর মা এখানে এসে খুব চেঁচামেচি করেছে তো?

বীরু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে।

— বালার কথা বলেছে নিশ্চয়ই?

বীরু আবার মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বলে।

— কি বলেছে?

বীরু ভাবছে কি বলবে। এর মধ্যেই বাবা আবার প্রশ্ন করে, আপিস থেকে কোনও লোক এসেছিল নাকি?

— এসেছিল।

— কী বলেছে?

— একটা কাগজ দিয়ে গেছে।

— কোথায় সেটা?

কাগজের কথা শুনেই বাবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। ওকে কোল থেকে নামিয়ে চট করে উঠে দাঁড়ায়।

— কোথায় আছে কাগজ, বল না?

— মা কোথাও রেখে দিয়েছে।

— সে কোথায়?

— মন্দিরে গেছে।

— দেবী কোথায়?

— পারোর বাড়িতে।

— কাগজে কি লেখা ছিল, কিছু জানিস?

— না।

— কবে এসেছে?

— কাল।

— কে দিতে এসেছিল?

— চাপরাশি

— সে কিছু বলেছিল?

— না।

ছোট্ট কাগজখানা নিয়ে বাবা এত বেশি চিন্তা করছে কেন, বীরুর ভারী আশ্চর্য লাগছে।

— বাবা, কাগজটায় কি লেখা থাকতে পারে?

বাবা নিজেই যেন নিজেকে এই প্রশ্নই করছে। একটু ভেবে, যেন নিজেকেই বলে, — দুটো ব্যাপার হতে পারে। হয় চাকরি থেকে বরখাস্ত, আর নয় এখান থেকে বদলি — বলেই বাবা আবার মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে বীরুর পাশে।

বীরু জানতে চাইছে মাকে জেহলাম স্টেশনে একলা ফেলে বাবা কোথায় চলে গিয়েছিল, কেন গিয়েছিল, এতদিন কোথায় ছিল, মায়ের বালা কোথায়, রামলাল কে, সে স্টেশনে এল কি করে? কিন্তু বাবার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখ দেখে ওর সব কৌতূহল শান্ত হয়ে যায়। শুধু একটা প্রশ্নই জেগে থাকে — বাবা, তুমি কি এত ভাবছ?

বাবা ওর মুখের দিকে চেয়ে একটু হাসে। ওর প্রশ্নটা যেন বুঝতে পেরেছে, আর নিজের সমস্যাগুলোর সঙ্গে যুঝতেও চাইছে তারই সঙ্গে।

বীরু সরে এসে আবার বাবার কোলের মধ্যে গিয়ে বসে, তারপর বাবার দুটো হাত নিজের হাতে নিয়ে তাকিয়ে থাকে বাবার মুখের দিকে। বাবার চোখ চকচক করছে, মুখের হাসি একটু একটু করে বদলে যাচ্ছে চোখের জলে।

— বাবা, তুমি বহেনজিকে চেনো?

বাবা মাথা হেলিয়ে 'হ্যাঁ' বোঝায়।

যেন জানতে চাইছে কি হয়েছে বহেনজির? বীরু ভেবে ঠিক করতে পারে না কিভাবে বহেনজির কথাটা বলবে।

— মা আর বহেনজির মধ্যে একদিন ঝগড়া হয়েছে।

— কি নিয়ে ঝগড়া?

বাবা কথাটা শুনে এত আশ্চর্য হচ্ছে কেন?

— একদিন সে এসেছিল আমাদের বাড়ি। মা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ও সেইদিনই নরেশকে নিয়ে লাহোর চলে গেছে। তাই নিয়ে দেবীও মায়ের সঙ্গে অনেক ঝগড়া করেছে। কথাগুলো বলে বীরু বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাবা ওর কথা বুঝতে পেরেছে তো!

— নরেশ কে? সেই ছেলেটা, যাকে ও নিজের ছেলে বানিয়ে রেখেছে? সে এখানে এসেছিল?

— আমাদের বাড়িতে আসেনি। পারো আছে না? ওই পারোর বাড়িতে ও দেবীর সঙ্গে দেখা করত। পারো বলত, দেবী ওকে বিয়ে করবে। মা যখন এল, সব জেনে গেল। মা দেবীকে খুব বকল, বলল, আমি এই বিয়ে কিছুতেই হতে দেব না! সেদিন মা আমাকেও খুব মেরেছিল। তাই তো আমার খুব জ্বর এসে গেল। এখনও তো জ্বর সারেনি। দেবী মায়ের সঙ্গে একদম কথা বলে না। ও বলেছে, আর কোনও দিন মায়ের সঙ্গে কথা বলবে না।

বীরু কথা বলেই চলেছে, বাবা খুব মন দিয়ে শুনছে। শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের জন্যে বাবা বোধ হয় নিজের দুশ্চিন্তাটাও ভুলে গেছে।

— মা বলে, নরেশ একটা লোচ্চা, বখাটে ছোঁড়া। বলে, ও বহেনজির ছেলে মোটেই নয়। সেদিন মা বহেনজিকে বলেছে, তুমিই ওকে বিয়ে করে নাও। তাই শুনে বহেনজি খুব রেগে একটাও কথা না বলে চুপচাপ বেরিয়ে গেল। সেইদিন সন্ধেবেলায় সে নরেশকে নিয়ে লাহোর চলে গেছে।

বাবা এমন ভাবে চেয়ে আছে ওর দিকে যেন আরও অনেক কথা জানতে চায়। কিন্তু বাবা আর কোনও প্রশ্ন করে না। বীরুও আর কিছু বলে না। ইতিমধ্যে দেবী এসে যায়। পারোও এসেছে তার সঙ্গে। বাবাকে দেখে ওরা একেবারে চমকে ওঠে। তারপর দেবী এগিয়ে এসে বাবার সামনে মাথা নিচু করে। বাবা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেই দেবীর চোখ দিয়ে টপটপ করে জল ঝরে পড়ে। দেবীকে কাঁদতে দেখে বীরুরও গলার কাছটা কান্নায় ভারী হয়ে আসে ও কিন্তু চোখের জল ফেলে না। পারোও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে। বীরু বাবার কোল থেকে সরে বসেছে। বাবা দেবীর মাথায় হাত বুলিয়ে চলেছে, যেন ভাবছে কি কথা বলা যায়!

বীরুর চারপাইয়ের পাশে মেঝেতে বসে পড়েছে দেবী। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফোঁপাচ্ছে। বাবা দেবীর মাথা থেকে হাত সরিয়ে নিজের মাথায় হাত রাখে। কি ভাবছে বাবা কে জানে। পারো নিঃশব্দে চলে যায় বাইরে। দেউড়ির দরজায় যদি পারোর সঙ্গে মায়ের দেখা হয়ে যায় তাহলে কি হবে? এতক্ষণ ধরে বীরুর যেন মনেই ছিল না, মা বলে কেউ একজন আছে। এখন মা'র কথা মনে পড়তেই মাথাটা ঘুরে উঠল। এই সময় যদি মা এসে দেখে ফেলে দেবী বাবার কাছে বসে আছে তাহলে যে কি হবে! কিন্তু বাবা তো নিষ্প্রাণ বসে আছে। বাবার মাথাও হাঁটুর ওপর রাখা। বীরুর মনে হচ্ছে, কেউ যেন ওর সামনে দুটো বড় বড় পুঁটলি রেখে দিয়েছে।

দেবী কাঁদছে কেন? ঠিক আছে, দেবী না হয় কাঁদতে পারে, কিন্তু বাবা, এত বড় হয়েও কাঁদছে কেন? বাবাকে এ রকম কাঁদতে খুব কমই দেখেছে, অবশ্য হাসতে তো প্রায় দেখেইনি বলতে গেল। একদিন খুব কেঁদেছিল, সেদিন মা পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল বাবাকে চুপ করাতে। সে কবেকার কথা, কি হয়েছিল কে জানে! বীরুর কিছুই মনে নেই। বীরু যখন খুব ছোট ছিল বোধ হয় সেই সময়কার কথা, মায়ের কাছেই গল্পটা শুনেছিল হয়তো। মাঝে মাঝেই কোথাকার কোন কালো গুহার মধ্যে থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে আসে এক একটা ভুলে যাওয়া স্মৃতি, মনের মধ্যে যেন বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে যায়। তারপর বহুক্ষণ ওর মন সেই সব অন্ধকার গুহার মধ্যে যেন হাতড়ে বেড়ায়।

দেবী মাথা তোলে, বাবার দিকে তাকায়। বাবা সেই ভাবেই বসে আছে হাঁটুর ওপর মাথা রেখে। দেবী আবার মাথা নামায় হাঁটুর ওপর। ওর দুই গাল চোখের জলে ভেজা, কেঁদে কেঁদে চোখ লাল। লম্বা লম্বা দুটো চুলের গুচ্ছ লেপটে রয়েছে গালের ওপর। বীরুর দিকে ও একবার তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। একটু পরে বাবা মাথা তুলে দেখে দেবীর দিকে। দেবী বসে আছে হাঁটুতে মাথা গুঁজে। বাবাও আবার মাথা নামিয়ে নেয়, বীরুর দিকে তাকায় না। বাবার মুখের ঢিলে, ঝুলে পড়া চামড়াও ভিজে ভিজে, চোখ দুটো লাল লাল পাকা কুলের মতো। মাথার সাদা সাদা এলোমেলো চুলগুলো যেন চোখের জলের একটু ভাগ চাইছে।

যদি দুজনে একবার একসঙ্গে মাথা তুলে পরস্পরের দিকে তাকায় তবে ওরা আবার হাঁটুর ওপর মাথা নামিয়ে ফেলবে না।

এখন মা যদি ফিরে এসে হইচই শুরু করে তবেই এই নিস্তব্ধতা কাটতে পারে। গলিতেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। সারা পাড়ার লোক যেন কোথাও মেলা দেখতে গেছে, নয়তো সবাই একসঙ্গে মারা পড়েছে। আমিও যদি একটুক্ষণের জন্যে মরে গিয়ে দেখতে পেতাম বাবা, মা আর দেবী তখন কি করছে!

ও চারপাই থেকে উঠে দাঁড়ায়। বাবা মাথা তুলে ওকে দেখছে না। ও আরও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে আশা করে, দেবী হয়তো দেখবে ওকে। কিন্তু মনে হচ্ছে, এরা দুজনেই কাঁদতে কাঁদতে বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে।

রান্নাঘর পর্যন্ত যেতে যেতে ওর বেশ মাথা ঘুরতে থাকে। একটাও মাজা গেলাস নেই রান্নাঘরে। ঘড়ায় জল নেই, উনুনেও আগুন নেই। দাদী ঠিকই বলত, এ বাড়িতে অলক্ষ্মীর বাসা।

ক্লান্ত বীরু বসে পড়ে রান্নাঘরের রোয়াকে।

খটাস করে খুলে যায় দেউড়ির দরজা। বাবা আর দেবী একসঙ্গে মুখ তুলে তাকায়। মা ভেতরে আসে দরজা বন্ধ করে। প্রথমে সোজা বীরুর দিকে এগোয়, তারপর নজর পড়ে ঘরের দিকে। বাবাকে দেখেই এমন ভাবে ছুটে যায় যেন কাছে গিয়েই গলা জড়িয়ে ধরবে। বীরু উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে।

বাবার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মা।

— আমার বালা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

বাবার মাথা হেঁট হয়ে যায়।

— আমার বালা বের করে দাও বলছি।

বাবা কোনও উত্তর দেয় না, একবার শুধু ঘাড় বেঁকিয়ে মাকে দেখে নেয়। হাঁটুতে হাত দুখানা জড়িয়ে বসে আছে বাবা।

মা এগিয়ে এসে বাবার পকেট হাতড়াতে থাকে। বাবার এত কাছে এসে গেছে, যে কোনও মুহূর্তে বাবা এখন মায়ের গলা টিপে ধরতে পারে। বীরুর ঠোঁট কাঁপছে, ও আবার বসে পড়ে।

বাবার সবকটা পকেট ঘেঁটেও যখন কিছুই পাওয়া গেল না, মা ভীষণ ক্ষেপে গেল।

— কোথায় গেল আমার বালা? কোথায় গেল? আমার বালা ফেরত না দিলে আমি বুক চাপড়ে মরব। এই মুহূর্তে ফিরিয়ে দাও — এখনই!

মা'র মুঠো করা হাত, সারা শরীর কাঁপছে।

কি হবে এখন?

হঠাৎ মা ভীষণ জোরে জোরে বুক চাপড়াতে শুরু করে। নিজের কামিজ টেনে ছিঁড়ে ফেলে ফর ফর করে। দুম দুম করে পা ঠোকে মাটিতে। নিজের চুল টেনে ছিঁড়তে থাকে। বীরুর চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার। ও দু'হাতে চেপে ধরে নিজের মাথাটা।

দেবী দাঁড়িয়ে দেখছে। এগিয়ে এসে মায়ের হাত চেপে ধরছে না কেন? ও-ও যেন প্রতিশোধ নিচ্ছে মায়ের ওপর! ও যদি কাছে যায়, তাহলে মা এখন ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে বুক চাপড়াবে? বাবা চুপ করে বসে আছে কেন? উঠে মায়ের হাত দুটো মুচড়ে চারপাইয়ের ওপর ফেলে দিলেই তো পারে ... কিন্তু বীরুর মাথাটা হাল্কা, যেন হাওয়ায় উড়ছে।

দেউড়ির দরজার বাইরে লোকজন এসে জড়ো হচ্ছে। মা বেহুঁশের মতো বুক চাপড়েই চলেছে, বলছে — আমি আজ নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলব! ... তোমার মাথায় চড়ে আজ আমি মরব! ... বল, আমার বালা কোথায়? কোথায়? কোথায়?

মা'র চোখ দুটো যেন একটা জ্বলন্ত বাগানের দুটি ফুল।

বাবা ওঠে শেষ পর্যন্ত। জোয়ান বয়সে রামলীলায় রাবণ সাজত বাবা। মা অনেকবার গল্প করেছে, তখন বাবার গায়ের রং ছিল তামার মতো, আর গলার আওয়াজ এমন ভয়ানক ছিল, বড় বড় লোকদেরও পিলে চমকে যেত।

এখন বাবার চেহারাটা অনেকটা সেই রকমই লাগছে, একদৃষ্টে দেখছে মাকে। মা একেবারে সামনে দাঁড়িয়ে দু'হাতে নিজের নিচু করা মাথায় অজস্র চড় চাপড়

মেরেই চলেছে। ঠিক যেন আগেকার দিনের কোনও রাজদরবারের কর্মচারী সেলাম করতে করতে পাগল হয়ে গেছে।

শেষ পর্যন্ত বাবার হাত উঠল। এক ঝটকায় মা গিয়ে পড়ল দেউড়ির দরজার ওপর। খুলে গেল দরজার শিকল। একসঙ্গে বেশ কয়েকজন লোক ঢুকে পড়ল বাড়ির মধ্যে। লোকজন দেখেই চিৎকার করে মা'র কান্না শুরু হয়ে গেল। বাবা দাঁড়িয়ে আছে মাথা নিচু করে। মেয়েরা সবাই চারদিক থেকে মাকে ঘিরে দাঁড়ায়। ধাক্কা খেয়ে মায়ের কপাল কেটে গেছে। বারবার কপালে হাত দিচ্ছে আর রক্তমাখা হাতখানা দেখে আরও চেঁচিয়ে কেঁদে উঠছে।

দেবী কিন্তু এখনও দূরে দাঁড়িয়ে।

বাবা ঘরের মধ্যে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। দরজা বন্ধ হতে দেখেই মা হাত ওপরে তুলে চিৎকার শুরু করে — ওগো, তোমরা দরজা খোলাও। না হলে ও হয়তো কিছু করে বসবে।

কয়েকজন স্ত্রীলোক ছুটে যায় দরজার দিকে। পুরষরাও ভেতরে এসে গেছে। সবাই মিলে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে আর বাবার নাম ধরে ডাকছে, দরজা খুলতে বলছে। মা-ও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দেয় — তোমরা দরজাটা খোলাও, না হলে ও কিছু করে বসবে! দেবীও এখন বাবাকে ডাকছে। কিন্তু বাবা ভেতর থেকে কোনও সাড়াও দিচ্ছে না, দরজাও খুলছে না।

বীরু রোয়াক থেকে উঠে রান্নাঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দেয়। শিকল তুলে দিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শিকলটা ভাঙা। রান্নাঘরের কোণে একটা দড়ি পড়ে আছে। বাবা এখনও দরজা খোলেনি। মা চেঁচাচ্ছে, — ভেঙে ফেল দরজা, না হলে ও কিছু করে বসবে! এখন অনেক লোক মিলে একসঙ্গে বাবাকে ডাকডাকি করছে, দরজা খুলতে বলছে। কিছু লোক গালাগালও দিচ্ছে। কয়েকজন মাকে বলছে, কি হয়েছে? ব্যাপারটা বলবে তো? মা সেই একই কথা আউড়ে চলেছে, — হায় হায়, তোমরা আগে দরজা ভেঙে ফেল, ও কিছু করে বসবে। রান্নাঘরের কোণে পড়ে থাকা দড়িটাকে মন দিয়ে দেখছে বীরু, কিন্তু ওর কান রয়েছে বাইরের কথাবার্তায়। দেবী চিৎকার করে ডাকছে —বাবা, বাবা, বাবা! মায়ের গলা ভেঙে গেছে — দরজা ভেঙে ফেল গো তোমরা। না হলে আমি কি করব? বাবার বন্ধু রামসিং বলছে, দরজাটা খুলে দাও ভাই, কি তামাশা দেখাচ্ছ সারা দুনিয়াকে! আর একজন বলে ওঠে, —খুলবে কি না? নয়তো পুলিশ ডাকব! দেবী বলছে, — কি বালা পেয়েছ তো? আরও বালা চাও! পারো বলছে, দেবী তুমি ডাক, বীরুকে বল ডাকতে। বীরু ডাকলে ঠিক খুলে দেবে! বাবা কি করছে ভেতরে বসে বসে? ... হায়, দরজা খুলে দাও! ... ভেঙে ফেল দরজা! ... যদি কিছু করে বসে, তখন আমি কি করব? ... এতই যদি ভয় তো আগে ভাবতে পারনি? ... রাম রাম, হে ঈশ্বর, হে জগদীশ্বর ... হায় হায়! আমি কি করে জানব! .... দরজা খোল ... দরজা খোল

ভাই! ... পুলিশ ডাকো। .... না, না, পুলিশ ডেকে কাজ নেই। ... বেচারার তো এমনিতেই চাকরির অবস্থা টালমাটাল ... হায় হায় কি করব গো? ...

বীরু রান্নাঘরের কোণে পড়ে থাকা দড়িটা তুলে নিয়ে নিজের গলায় জড়ায়। এটা ওদের গরুর দড়ি। গরুটা মরে গেছে। গরুর দড়ি এত ছোট হবে কি করে? এটা নিশ্চয়ই বাছুরের দড়ি। বাছুরটাও বোধহয় গরুর সঙ্গেই মরে গেছে। বাবা এখনও দরজা খোলেনি ... দরজাটা ভেঙে দাও না। ও যদি কিছু করে ফেলে থাকে ... তোমরা সব চুপ কর, আমাকে কথা বলতে দাও। ... তুমি কেবল কথাই বলতে থাক। আমি বলছি পুলিশ ডাকা হোক। ... পুলিশ কি করবে? ... তা নয়তো কি তুমি করবে? ... হায় হায়, দরজা ভাঙো তোমরা। কেন তামাশা করছ?...ঠিক আছে কিছু করতে হবে না। বীরুকে ডাকো ... রাম, বীরু ডাকলে নিশ্চয় খুলে দেবে। ... বীরু কাঁপছে, বাবা দরজা খুলে দাও। ... বীরু বলছে, বাবা দরজা খোল! ... এদিকে বীরু নিজের গলার দড়িতে একটা ফাঁস লাগায়। ... কিন্তু এ আওয়াজটা তো মায়ের গলার, না না দেবীর, না বোধহয় জলালপুরণীর। না না, রামসিংয়ের, না আসলামের, না না পারোর ... বীরু দড়িটা টানতে থাকে আর সব আওয়াজগুলো মিলে মিশে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে।

বাবার ঘরের দরজা ভেঙে গেল। এদিকে রান্নাঘরে বীরুও মাটিতে পড়ে যায় ধপ করে। পড়ে যেতেই ওর গলার ফাঁসটা কিছুটা আলগা হয়ে আসে। বাইরের শোরগোল আবার একটু একটু করে এসে পৌছয় ওর কানে।

□□

Lasertypeset at Ashalata Software, Calcutta-700091
and printed at The Central Electric Press, New Delhi-110028